কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারি ১৯৮৭

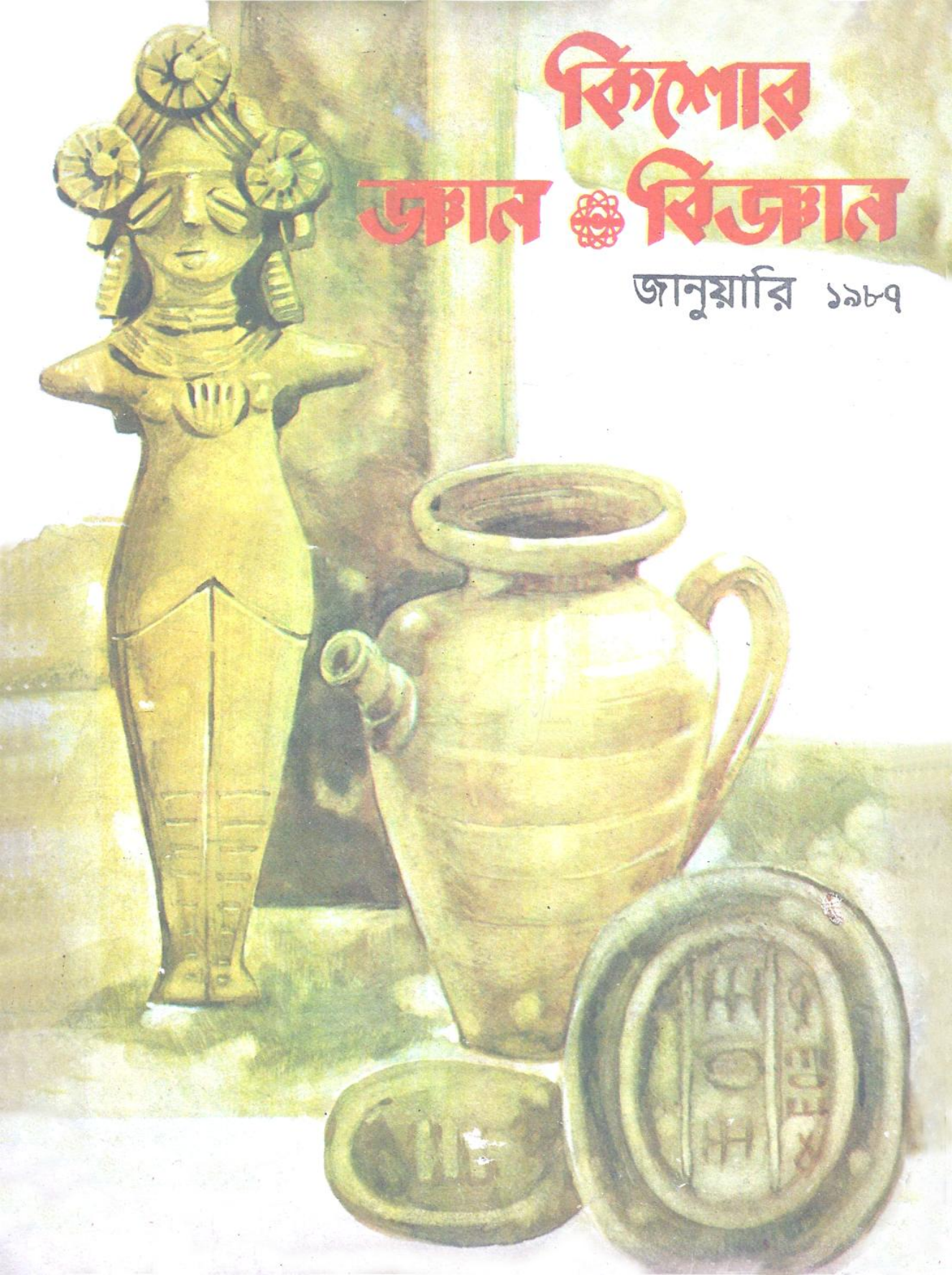

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স** ১৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **চারমূর্তি** ১০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **রামধনু** ১০
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
গুপীগাইন বাঘাবাইন ৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদার জুড়ি নেই** ১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **কম্বল নিরুদ্দেশ** ৮
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের মজার গল্প ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা** ১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **ঝাউবাংলোর রহস্য** ৭
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০

ঘনাদা কাহিনীর নতুন চমক !

মৌলিক কাহিনী সার বিপণন সংস্থা ঘনাদাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে— গল্পের প্লট সাপ্লাই করবে ঘনাদা কিভাবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ১৫

জীবনচরিতমালা

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি
প্রণীত জীবন চরিতমালা
প্রতি খণ্ড দশ টাকা

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ॥ পরমাণু বিজ্ঞানী ভাবা
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ॥ কৃতী বিজ্ঞানী
মেঘনাদ ॥ বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র
কৃতী বিজ্ঞানী সি· ভি· রমন
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ
পরমাপ্রকৃতি সারদামনি
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
আলোকময়ী শ্রীম

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫
মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০
ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥
আমাজনের অরণ্যে ৮
সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

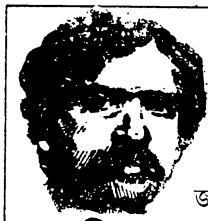

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন

জগদীশচন্দ্র বসু

কিশোর রচনা সমগ্র ২৫

কিশোর ক্লাসিকস্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **তেপান্তর** ২০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **কিশোর অপু** ২৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়॥ **ছোটদের কাজল** ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা বিচিত্রা** ২৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ **বাঙলার ডাকাত** ২৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ নবম সংখ্যা জানুয়ারি 1987

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিত্রপত্র 4 ঃ **দপ্তর থেকে** ঃ পৃথিবীর কক্ষপথ ও বরফযুগ ॥ সমরজিৎ কর 9

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ অপমৃত্যু ঃ মহঃ বরজাহান 47 ঃ হিমানী সম্প্রপাত (হুগো জার্গস ব্যাক) ॥ শ্রীধর সেনাপতি 31

বিশেষ রচনা ঃ প্রাচীন ভারতের কারিগরী শিল্প ॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 19

পড়াশোনা ঃ উদ্ভিদকলা ॥ দিনোজ কুমার দে 18 ঃ পদার্থবিজ্ঞানের কথা ॥ অজয় চক্রবর্তী 51 ঃ ভৌত বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ॥ অমরনাথ রায় 52 ঃ চাঁদার সাহায্য ছাড়া কোন অঙ্কন ॥ সজল চক্রবর্তী 17 ঃ ঐচ্ছিক রসায়নের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ॥ অমরনাথ রায় 54

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা ঃ মজার ইলেকট্রনিকস প্রজেক্ট ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 16 ঃ লেসারের কথা ॥ দীপক কুমার দে 41 ঃ সচিত্র টেলিফোন ॥ পথিক মণ্ডল 42 ঃ বিজ্ঞানের খবর ॥ অমিত চক্রবর্তী 66 ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 15 ঃ বিজ্ঞান সংবাদ 50

জীবজন্তু ও গাছপালা ঃ তুলসী মহিমা ॥ ছন্দোময় মণ্ডল 30 ঃ বিলুপ্ত পাখিরা ॥ রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী 39

রঙিন ফিচার ঃ প্রাণীবিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 12 ঃ সিনিয়র ক্যুইজ ও ফটো ক্যুইজ কনটেস্ট 58 ঃ গ্রামোফোন আবিষ্কারের গল্প ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 13 ঃ জুনিয়র ক্যুইজ ও ফটো ক্যুইজ 14 ঃ বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীরমণ্ডল 57 ঃ ভূগর্ভের সম্পদ ও জীবজন্তু ॥ অমরনাথ রায় 55 ফারগাছের কোণ ও ছুঁচলো মুখো প্যাঙ্গেলিন ॥ তারকমোহন দাস ও সীমা সেন 56

ছড়া ঃ আবিষ্কার ॥ আশাদেবী 30

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ কুরী এবং রেডিয়াম ॥ পৃথ্বীজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 21 ঃ বেতার আবিষ্কার ॥ সমীর কুমার সূত্রধর 27 ঃ গণিতজ্ঞ রামানুজন ॥ সৌমেন দাস 29

ধারাবাহিক উপন্যাস ঃ নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 36 ঃ ভারতের গবেষণাগার ঃ ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স ॥ বিমান বসু 7

ছবিতে গল্প ঃ খুদে বিজ্ঞানী ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস ॥ গৌতম কর্মকার 43

ছোটদের দপ্তর ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 59 ঃ অটোপাওয়ার সাপ্লাই ॥ অভিজিৎ বিশ্বাস ও সুবীর ঘোষ 61 ঃ শব্দকুট ॥ সুজনবন্ধু সামন্ত 63 ঃ প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 63

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি ঃ অলয় ঘোষাল

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর। সম্পাদক ঃ রবীন বল। সহসম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত।

দূরবীণের আবিষ্কার ও ব্যবহার

শ্রীযুত বিমান বসু 'ভারতীয় জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান' (কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান মার্চ 1986) প্রবন্ধে লিখেছেন : 'তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে দূরবীণ আবিষ্কার হয়েছিল 1609 সালে।' পৃষ্ঠা-9

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মহাশয় 'খ্রিস্টপূর্ব' যুগেও দূরবীনের ব্যবহার ছিল' (জুন 1986) শীর্ষক চিঠিতে লিখেছেন : 'একথা ঠিক, 1609 সালে আধুনিক উন্নত দূরবিন যন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব…' পৃষ্ঠা-4

হ্যাঁ, 1609 সালে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, ইটালীর গ্যালিলিও গেলিলি (1564—1642) একটি টেলিস্কোপ বা দূরবীন যন্ত্র তৈরি করেন। কিন্তু 1609 সালে গ্যালিলিও নির্মিত দূরবীনই আধুনিক যুগের প্রথম দূরবীন নয়।

আমরা জানি ইউরোপে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান নাম ইস্টানবুল-Istanbul)-এর পতন অর্থাৎ 1453 খ্রীস্টাব্দ থেকে।

গ্যালিলিও নির্মিত দূরবীন (1609)-এর এক বছর পূর্বে (1608) ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হানস্ লিপার্শে (Hans Lippershey : 1570—1619) দূরবীন যন্ত্র তৈরি করেন। গ্রীক গণিতজ্ঞ আইয়ানস্ ডিমিসিয়ানি (Ioannes Dimisiani) 'Teleskopein' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই 'Tele'-র অর্থ 'দূর' (far) এবং 'Skopein' এর অর্থ 'দেখা' (to See)। 'Teleskopein' এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হল 'Telescope' যার অভিধানগত বাংলা প্রতিশব্দ হল 'দূরবীন' বা 'দূরবীক্ষণ যন্ত্র'। Telescope শব্দটি 1650 সালে জনপ্রিয় হয়।

কিন্তু দূরবীন-এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হানস্ লিপার্শের সমসাময়িক অন্য এক ওলন্দাজ চশমা-নির্মাতা জাচারিয়াস জানসেন (Zacharias Jansen : 1580-1638) 1604 সালে একটি 'টেলিস্কোপ' যন্ত্র তৈরি করেন বলে দাবি করেন। সম্ভবত, জানসেন-এর নিকট থেকেই লিপার্শে এই ধারণা পান।

উৎস : (1) Eyes on the Universe—Dr. Isaac Asimov (Ander Deutsch Ltd London)
(2) Imprint, May 1977

ইউরোপে দৃষ্টি-সহায় কাচ (Lens)-এর প্রণালী-বদ্ধ অধ্যয়ন করেন ইংরাজ পণ্ডিত রবার্ট গ্রোসেটেস্ট (Robert Grosseteste : 1175-1253) এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী-দার্শনিক রাজর বেকন (Roger Beacon : 1220-1292 (?)]।

উৎস : ঐ

যদিও আরবীয় বিজ্ঞানীদের লেনস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রমাণ পাওয়া যায় তথাপিও টেলিস্কোপ তৈরির জন্য প্রথম লেনস ব্যবহার করেন রজার বেকনই।

উৎস : Guinness Book of World Records (1981 Edition) Page 176

ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হানস লিপার্শে 1608 সালের 2রা অক্টোবর তারিখে আধুনিক 'প্রতিসারক দূরবীন-এর নমুনা' Prtootype of modern refracting Telescope) তৈরি করে যুদ্ধের প্রয়োজনে নেদারল্যাণ্ড সরকার-এর

আলোকের গতি

'নীল দেশে' গল্পের লেখক প্রচেতা রঞ্জন নন্দী লিখেছেন এক আলোক বর্ষ মাইল মানে 1,80,000 মাইল। কিন্তু আমরা জানি আলোকের গতি এক সেকেণ্ডে 1,86,000 মাইল। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে এরকম তথ্য থাকা ঠিক নয়।

অর্ণব সরকার। কার্বালা রোড। হুগলী।

অনুরূপ অভিমত পোষণ করে চিঠি দিয়েছেন :

জি. বি. হিপার। অশোকা ফার্মেসী, ক্যানিং টাউন, 24 পরগনা।

সুমন্ত মুখার্জী। 2A/30 মহিষকাপুর রোড। দুর্গাপুর 5, বর্ধমান।

আপনাদের বক্তব্যই ঠিক। সম্পাদক

মডেল নির্মাণ

মডেল নির্মাতাদের ঠিকানা প্রতি সংখ্যায় ছাপা হলে উপকৃত হব।

রবীন বসু। কলকাতা-36

প্রসঙ্গ : দপ্তর থেকে

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, জুলাই, 1986 সংখ্যায় 'দপ্তর থেকে' দ্বিতীয় কলমে 18শ লাইনে লেখা হয়েছে—'উদ্ভিদের পরিমাণ যদি বেশি হয়, জলে অক্সিজেন কমে।'— কেন বুঝলাম না। উদ্ভিদের পরিমাণ যাই হোক না কেন উদ্ভিদ নিজের শ্বসনের জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে সালোক-সংশ্লেষের সময় সর্বদাই তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন উৎপন্ন করে। তা হলে অক্সিজেন কমেই বা কেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডই বা বাড়বে কেন? এ ব্যাপারে কেউ ব্যাখ্যা বিশদ করলে বাধিত হব।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র মল্লিক
শিক্ষক, মালদা জিলা স্কুল, মালদা

হাতে সমর্পণ করেন। (উল্লেখনীয়, নেদারল্যাণ্ড স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে স্পেইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।)

উৎস ঃ (i) Guinness Book of World Records, Page 176
(2) Eyes on the Universe-Dr. Isaac Asimov
(3) Imprint, May 1977

অন্যদিকে, গ্যালিলিও 45 বছর বয়সে, 1609 সালের মে মাসে যখন ভেনিস ভ্রমণ করেন তখন শুনতে পান যে এক ওলন্দাজ চশমা নির্মাতা একটি টেলিস্কোপ যন্ত্র তৈরি করেছেন এবং তিনি ইটালীর পাদুয়ায় ফিরে গিয়ে নিজেও একটি টেলিস্কোপ যন্ত্র তৈরি করেন। তিনিই টেলিস্কোপ, জ্যোতির্বিদ্যার কাজে লাগালেন।

অতএব, 1609 সালে দূরবীন আবিষ্কার হয়েছিল কথাটি সঠিক নয়।

সমীরকুমার সূত্রধর, বঙাইগাঁও, আসাম।

প্রথম ও পরবর্তী এফ্. আর্. এস্ গণ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আগস্ট সংখ্যায় লেখক বিমলেন্দু মিত্রের 'প্রথম এফ আর এস আদেশীর কার্শেটজী' লেখাটি গভীর মনোযোগের সাহত পড়লাম। জগদীশচন্দ্রের জন্মেরও সতের বছর আগে 1841 সালে কার্শেটজী রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন জানতে পেরে আনন্দ পেলাম। কিন্তু তাঁর লেখায় আমাদের দেশেরই পরের যুগের এফ আর এস'দের নামের তালিকায় প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নাম না দেখে খুব অবাক লাগল। যদিও লেখক বেশ বুদ্ধি করে তালিকার শেষে 'প্রভৃতি' কথাটি যোগ করে ধরা ছোঁয়ার বাহিরে চলে গেছেন।

মহলানবিশ 1945 সালে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। মনে হয় আচার্য সত্যেন বসুর অনেক আগেই তিনি এই সম্মান লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন ও সেখানেই গবেষণা করতেন। কিন্তু হঠাৎই তাঁর জীবনে এক পরিবর্তন আসে। তিনি পারসংখ্যান নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। মহলানবিশ ভারত পরিসংখ্যান বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার অনন্য অধিনায়ক। তিনিই ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ও কর্মসচিব ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যান কমিশনের সভাপতি হয়েছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাঁকে নানা সম্মানে ভূষিত করে। ভারত সরকার 1968 সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই প্রশান্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের খুব স্নেহধন্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বৈজ্ঞানিক (Scientist) বলে ডাকতেন। বহু লেখায় তাঁর প্রমাণ আছে। প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলকুমারীর বিবাহ রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই হয়েছিল। এ বিবাহে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আচার্যরূপে কাজ করেছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র বেশ কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিবের কাজ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি বিশ্বের বরেণ্য পরিসংখ্যাবিদদের মধ্যে একজন।

অনিচ্ছাকৃত জেনেও না লিখে পারলাম না। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় সংখ্যায় এই মহলানবিশের সম্বন্ধে কিছু জানালে বাধিত হব। ধন্যবাদান্তে,

গৌতম দে
টাকী গভঃ স্কুল, শিয়ালদহ, কলিকাতা-9

পুজো সংখ্যা

কলকাতা থেকে অনেক দূরে চাকরী সূত্রে আছি। তবুও আপনাদের কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়ে ফেললাম। বেশ ভাল লেগেছে।

তবে একটা রচনাকে কেমন খাপ-ছাড়া মনে হল। শ্রী কা না ই লা ল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চা তেক্কা পুট' রচনাটির মাধ্যমে কিশোরদের সম্ভাবনা-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে। কিন্তু রচনাটিতে সাহিত্যত্রুটি নজরে পড়ল। এক জায়গায় লেখক লিখেছেন 'কারো কথায় কান না দিয়ে আমি বলতে শুরু করলাম'—কিন্তু তার আগে কেউ কিছু বলেছে এমন তো রচনাতে উল্লেখ নেই। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় সাহিত্যত্রুটি হয়তো হতে পারে কিন্তু বিশেষভাবে চোখে পড়ার মত ভুল কেন হবে?

বরুণ কুমার ঘোষ
অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার
তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন বোম্বে

এবার শারদীয় 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' এককথায় অপূর্ব।

উপন্যাসের মধ্যে ভালো লাগল 'ম্যাটার হর্ন', 'টিবোক্সা'।

অদ্রীশ বর্ধনের 'ম্যাটার হর্ন' পড়ে খুব ভালো লাগল। অদ্রীশবাবু সত্যিই প্রত্যেক বছর শারদীয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে একটা করে 'ফ্যান্-টাস্টিক' উপন্যাস উপহার দেন। গতবার যেমন দিয়েছিলেন "লালভিচ লাড্ডুকং"।

'হ্যালি কি কি জানিয়ে গেল' প্রবন্ধ গুচ্ছে সব থেকে ভাল লাগল জগদীশ-চন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা। রমাতোষ সরকারের লেখাও ভাল লাগল। গল্পতে ভালো লাগল অদৃশ্য ঝড়, ক্রুফোগ্রহের শিশু, গন্ধ।

'পশুপাখি-গাছপালা' প্রবন্ধগুচ্ছের সবকটি প্রবন্ধই ভালো লাগল। ইতি

সৌমিত দাস
প্রযত্নে ঃ—সত্যেন্দ্র নাথ দাস।
চকভবানী, বালুরঘাট।
পঃ দিনাজপুর। Pin-733 101

এক ডজন নতুন বই

পাঁচটি কিশোর ক্লাসিকস্

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কিশোর গল্প সমগ্র ৩০.
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ হারানো কাকাতুয়া ১০.
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ প্রেতাত্মার প্রতিশোধ ৮.
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০.
অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ বিন্নি ধানের খই ৮.

পাঁচটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

পার্থসারথি চক্রবর্তী ॥ বুদ্ধি নিয়ে খেলা ১০.
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস্ ১০.
বিমান বসু ॥ নক্ষত্র পরিচয় ১০.
জয়ন্ত বসু ॥ পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময় ১৫.
সমরজিৎ কর ॥ পরমাণু প্রসঙ্গ ১৫.

এবং দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

সমরজিৎ কর সম্পাদিত
স্টুডেন্টস্ বুক অব নলেজ ৫০.

অমরনাথ রায় সম্পাদিত
স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া ২৫

বই মেলায় প্রকাশিত হবে

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স

বিমান বসু

বলতে পারো, ভারতের একমাত্র গবেষণাগারের নাম যেখানে গবেষণা চালিয়ে কোনও বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছেন? সেই বিশ্ব-বিখ্যাত গবেষণাগারটি হলো কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, আর সেই নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীটি হলেন চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমন। রমন কালটিভেশন অব সায়েন্স-এ গবেষণা শুরু করেন 1907 সালে। তারপর 1933 সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ 27 বছর সেখানে কার্যরত ছিলেন। তখনকার 210 নং বৌবাজার স্ট্রীটস্থিত প্রতিষ্ঠান ভবনের ছোট এক অন্ধকার ঘরে ফটোগ্রাফিক প্লেটে তোলা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কতকগুলি বর্ণালী রেখার ভিত্তিতেই রমন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কার করেন। 1928 সালে প্রকাশিত তাঁর ঐ আবিষ্কার বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সমাজে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল এবং মাত্র দু'বছরের মধ্যেই, 1930 সালে ঐ আবিষ্কারের জন্য রমনকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ভারতের পক্ষে এছিল এক অসামান্য গৌরব।

রমন ছাড়াও ভারতের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অ্যাসো-সিয়েশনে গবেষণা চালিয়েছেন অথবা অন্যভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কে. এস. কৃষ্ণান, এল. এ. রামদাস, এস. ভাগবন্তম, নীলরতন সরকার, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, শিশিরকুমার মিত্র, শান্তিরঞ্জন পালিত, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় 1876 সালের 15 জানুয়ারি তারিখে। কিন্তু এর গোড়াপত্তন হয় তারও অনেক আগে।

যখনকার কথা বলছি সে সময় মুষ্টিমেয় কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশে উচ্চমানের বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণা চালানোর কোনও সুযোগ ছিল না। ঐ সময় কোনও ভারতীয়ের পক্ষে বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার কথা একরকম অভাবনীয় ছিল। এমনকি, মোটামুটিভাবে কিছুটা বিজ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্য সুযোগও ছিল খুবই সীমিত। এসব কথা ভেবেই, 1869 সালের Calcutta Journal of Medicine-এর আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সেকালের খ্যাতনামা চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সর্বপ্রথম এজাতীয় সুযোগ সুবিধার জন্য একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি লেখেন—"আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান চাই যাতে একসঙ্গে মিলিত হবে লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের এবং বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স-এর চরিত্র ও উদ্দেশ্য। আমরা যে প্রতিষ্ঠানটি চাই তার কাজ হবে জনশিক্ষা। সেখানে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর নিয়মিতভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকবে, বক্তারা বিষয়বস্তু বোঝাবার জন্য পরীক্ষা দেখাবেন, এবং শ্রোতাদেরও আহ্বান করা হবে নিজেদের হাতে সেসব পরীক্ষা সম্পাদন করতে। আমাদের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠানটি থাকবে সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে।"

ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অর্থসাহায্যের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হয়। দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ আবেদনে সাড়া দেন এবং 1875 সালের নভেম্বর পর্যন্ত নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় প্রায় আশি হাজার টাকা। অবশেষে 1876 সালের 15 জানুয়ারি তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এক সভায় "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স"-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন সে সময়কার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল্। সেবছরই 29 জুলাই 210 নং বৌবাজার স্ট্রীটের এক পুরানো বাড়িতে অ্যাসোসিয়েশনের প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হয়। খ্যাতনামা শিক্ষক ফাদার লাফোঁ, স্বয়ং মহেন্দ্রলাল সরকার ও কানাইলাল দে অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম অবৈতনিক লেকচারার নিযুক্ত হন। লাফোঁ 1876 সালের 24শে আগস্ট থেকেই পদার্থবিদ্যার ক্লাশ নিতে শুরু করেন। মহেন্দ্রলালও পদার্থবিদ্যা পড়াতেন, কিন্তু তিনি 1878-এর আগে নিয়মিত ভাবে ক্লাশ শুরু করতে পারেন নি। কানাইলাল দে শেষ পর্যন্ত একেবারেই ক্লাশ নিতে পারেন নি। তাঁর বদলে 1879 সাল থেকে রসায়নের ক্লাশ নেন তারাপ্রসন্ন রায়।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। বৌবাজার স্ট্রীটে যে বাড়িতে অ্যাসোসিয়েশনের কাজ শুরু হয় সেটা সরকার অ্যাসোসিয়েশনকে লীজে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল একটা অত্যন্ত পুরনো বাড়ি। তার ঘরগুলি ছিল নিতান্তই ছোট, ক্লাশের বা ল্যাবরেটরীর জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। সুতরাং তাতে বেশিদিন অ্যাসোসিয়েশনের কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। অবশেষে এ সমস্যারও সমাধান হলো। অ্যাসোসিয়েশন ঐ পুরনো বাড়ি ও জমি কিনে সেখানে বড় লেকচার হল তৈরি করবে ঠিক করলো। এবারেও জনসাধারণ মুক্তহস্তে অর্থদান করলেন। 1884 সালের 12ই মার্চ তারিখে বড়লাট লর্ড রিপন নতুন লেকচার হলের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

এরপর 1891 সালে ঐ প্রাঙ্গণেই নতুন গবেষণা ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়। তার নাম রাখা হয় ভিজিয়ানাগ্রাম গবেষণাগার। পরবর্তীকালে ঐ নতুন গবেষণা-ভবনের এক ছোট ঘরে রমন তাঁর 'রমন এফেক্ট' নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই ঐতিহাসিক গবেষণাগারটি আজ আর তোমরা দেখতে পাবে না। 1952 সালে আসোসিয়েশনের গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য বিভাগগুলি যাদবপুরের নতুন ভবনে চলে যাওয়ার পর বৌবাজারের পুরনো বাড়ি, গবেষণাভবন ইত্যাদি বিক্রি করে দেওয়া হয়। পরে ঐ গবেষণাভবন ভেঙে সে জায়গায় বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা তৈরি হয়েছে যেখানে আজ পড়ানো হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব নিকাশের বিষয়।

1876 সালে নিয়মিত ক্লাশ শুরু হওয়ার পর থেকেই অ্যাসোসিয়েশনের ল্যাবরেটরীগুলির জন্য রকমারি যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারগুলিকে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার উপযুক্ত করে সাজিয়ে তোলা হয়।

মহেন্দ্রলাল সরকার, ফাদার লাফোঁ এবং তারাপ্রসন্ন রায় ছাড়াও বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিয়মিতভাবে অ্যাসোসিয়েশনে এসে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। 1885 সালের পর কয়েক বছর জগদীশচন্দ্র বসু অ্যাসোসিয়েশনে নিয়মিত পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের প্র্যাকটিকাল ক্লাশ নিয়েছিলেন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর নিজের গবেষণায় ব্যস্ত থাকায় তিনি এই প্রশিক্ষণ বেশিদিন চালাতে পারেন নি।

1887 সালে অ্যাসোসিয়েশনে পড়াতে আসেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল ভৌতিক আলোক বিজ্ঞান, গাণিতিক পদার্থবিদ্যা ও বিশুদ্ধ গণিত। 1890 সাল পর্যন্ত তিনি অ্যাসোসিয়েশনে পড়িয়েছিলেন।

1907 সালের আগস্ট মাসে চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমন আসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। সে সময় তিনি কলকতায় ভারতীয় রাজস্ব বিভাগে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল-এর পদে নিযুক্ত ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনে যোগদানের পর প্রায় দশ বছর ধরে তিনি চাকরি ও গবেষণা দুই-ই একসঙ্গে চালিয়ে যান। 1917 সালে কলকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে পালিত

(শেষাংশ 10 পৃষ্ঠায়)

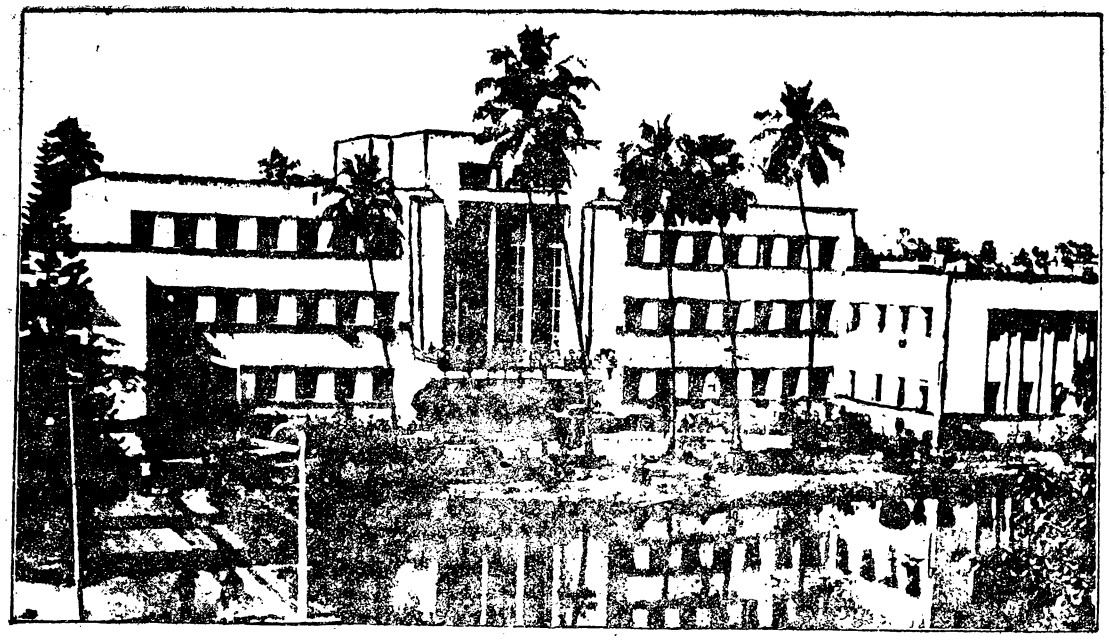

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স

পৃথিবীর কক্ষপথ এবং বরফ যুগ

সমরজিৎ কর

পৃথিবীর বহু ঘটনাই বিজ্ঞানীদের কাছে আজও যেন বড় রকমের ধাঁধা। যেমন ধরো, সাগর মহাসাগর? সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া আর কোন গ্রহে সাগর মহাসাগর নেই। এর কারণ কী? সাগর মহাসাগরের জল প্রতি মুহূর্তে বাষ্পীভূত হচ্ছে। সেই বাষ্পের কিছুটা প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর পরিমণ্ডল ছেড়ে মহাকাশে চলে যাচ্ছে। তবু ভূতাত্ত্বিকরা মনে করেন সুদূর অতীত থেকে আজও পর্যন্ত পৃথিবীতে জলের পরিমাণ একই রকম থেকে গেছে। এরই বা কারণ কি? এক সময় বলা হত, সমুদ্রের নিচের ভূস্তরে ধাতব রাসায়নিক যৌগ হিসেবে সঞ্চিত রয়েছে প্রচুর জল। জলীয় বাষ্প হিসেবে পৃথিবীর বাইরে যে পরিমাণ জল চলে যায়, ঠিক ততটা জল ওই রাসায়নিক যৌগ থেকে বেরিয়ে এসে ঘাটতি পূরণ করে। এ ব্যাপারে এখন আবার আরও একটি নতুন কথা বলছেন কোন কোন বিজ্ঞানী। তাঁদের মতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতিদিন এসে প্রবেশ করছে কম করেও কুড়িটি ধূমকেতু। এই ধূমকেতুগুলির প্রতিটির 'কোমা' বা মস্তকদেশে থাকে কুড়ি টনের মত জল। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর ঘনীভূত হয়ে ভূপৃষ্ঠে এসে হাজির হয়। সৃষ্টি করে সাগর মহাসাগর। পূরণ করে সাগর মহাসাগরের জলের ঘাটতি। মাঝে মাঝে ভূপৃষ্ঠের ব্যাপক অঞ্চল পুরু বরফ স্তরে ঢেকে যায়। যে সময় ধরে এই কাণ্ডটি ঘটে, সেই সময়টিকে আমরা বলি বরফ যুগ। কেন সৃষ্ট হয় বরফ যুগ? কেনই বা তার অবসান ঘটে? বলতে কি, প্রশ্নের যেন শেষ নেই।

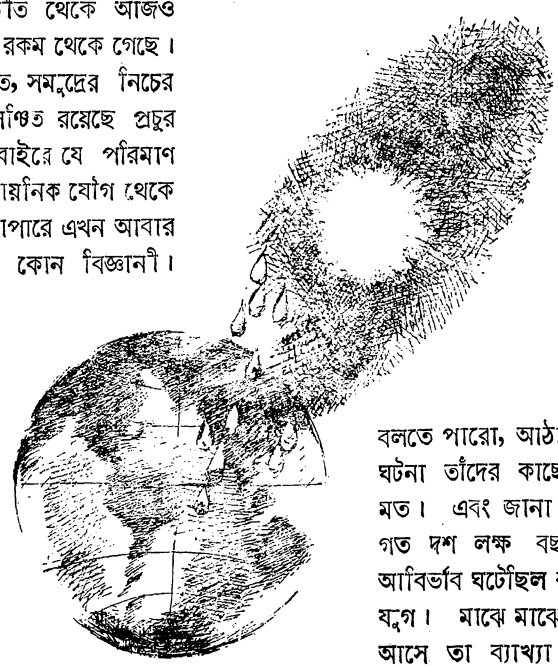

বরফ যুগের কথাই ধরো। আজ থেকে আঠারো হাজার বছর আগে পৃথিবীর স্থলভাগের এক তৃতীয়াংশই ছিল বরফে ঢাকা। উত্তর আমেরিকার কোন কোন জায়গা কয়েক কিলোমিটার পুরু বরফ স্তরের নিচে তখন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সে সব জায়গার মধ্যে ছিল অরিগনের দক্ষিণাংশ এবং নিউইয়র্ক। কুমেরু মহাদেশ এবং ইউরেশিয়ার কিছু অংশেও একই অবস্থা। আলপ্‌স এবং আন্দেজ পর্বতমালার শিখর দেশ থেকে হিমবাহ ছড়িয়ে পড়েছে সমতল পর্যন্ত। আর সেই বরফ তো সমুদ্রের জল জমেই তৈরি হয়েছিল? ফলে যা হয়। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে ডাঙ্গায় এসে বরফ হিসেবে জমার ফলে সাগর মহাসাগরের গভীরতা গেল কমে। তখন সাগর মহাসাগরের গভীরতা আজকের চেয়ে প্রায় 100 মিটার কমে গিয়েছিল। পৃথিবীর মোট জলের পাঁচ শতাংশ তখন ডাঙ্গায় বরফ হিসেবে বিরাজ করছে। বুঝতেই পারছো, এর ফলে স্থলভাগে আবহাওয়ার তাপমাত্রাও কমে যায়। আজকের তুলনায় গড়ে প্রায় 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

ভূ-তাত্ত্বিকরা সময় গোণেন লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি বছরের হিসেবে। অতএব বলতে পারো, আঠার হাজার বছর আগের ঘটনা তাঁদের কাছে সাম্প্রতিক ঘটনারই মত। এবং জানা গেছে, তার আগেও, গত দশ লক্ষ বছরে পৃথিবীর বুকে আবির্ভাব ঘটেছিল কম করেও দশটি বরফ যুগ। মাঝে মাঝে কেন এই বরফ যুগ আসে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানান তত্ত্বের কথাও বলেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো তত্ত্বটি এই ঃ মাঝে মাঝে (এ ক্ষেত্রে হাজার, লক্ষ বা কোটি বছর অন্তরই বোঝান হয়েছে) পৃথিবীর বুকে এসে প্রচণ্ড বেগে ঠিকরে পড়ে অতিকায় উল্কা অথবা গ্রহাণু। যাদের ব্যাস পঞ্চাশ থেকে একশ কিলোমিটার বা তারও বেশি। ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে সেই উল্কা সৃষ্টি করে উত্তাপ। আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায় উল্কা অথবা গ্রহাণু। সৃষ্টি হয় ধূলিকণা। ধূলিকণা উত্তপ্ত বাতাসে ভর করে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে পুরু মেঘের মত। সূর্য পড়ে ঢাকা। তার আলো ভূপৃষ্ঠে তেমন পৌঁছোয় না। দিবাভাগ হয়ে পড়ে অমাবস্যার মত অন্ধকার। এই অবস্থাই চলে দিনের পর দিন, অথবা কয়েক মাস ধরে। ফলে, ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রা কমে। প্রথমে প্রচণ্ড

উত্তাপে সাগর মহাসাগরের জল বাষ্পে পরিণত হয়। পরে তাপমাত্রা কমে এলে সেই বাষ্প জমে বরফ হয়ে থিতিয়ে পড়ে স্থল এবং জল ভাগে। তাপমাত্রা কমায় বহু অঞ্চলে সমুদ্রের জলও জমে যায়। আর এইভাবেই সৃষ্টি হয় বরফ যুগ।

আর একটি তত্ত্বও খুব জোরালো হয়ে উঠেছে এখন। যার নাম মিলানকোভিচ্ তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি দাঁড় করিয়েছেন যুগোশ্লাভিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী মিলুটিন মিলানকোভিচ্ বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি। তাঁর এই তত্ত্বে বলা হয়েছে ঃ পৃথিবী তার পরিক্রমণ পথ ধরে সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণ করছে। এই পরিক্রমণের সময় ঘটে দুই ধরনের ঘটনা। এক, মাঝে মাঝে পৃথিবী স্বাভাবিক পথ থেকে কিছুটা সরে যায়। দুই, পৃথিবীর অক্ষটি মাঝে মাঝে নতুন পথে চলার সময় কিছুটা বেশি ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে তার বিভিন্ন অক্ষাংশে কোথাও সূর্যের উত্তাপ এসে পড়ে বেশি কোথাও কম। যে অঞ্চলে উত্তাপ কম পড়ে, সেখানে দেখা দেয় বরফ যুগ।

শেষের কথাটা অবশ্য তোমরাও জান। শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে সরে যায়। তাই ওই সময় উত্তর গোলার্ধে সৌররশ্মি তির্যকভাবে এসে পড়ে এবং তার ফলে উত্তর গোলার্ধে দেখা দেয় শীতকাল। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন সৌররশ্মি খাড়াভাবে পড়ে বলে সেখানে দেখা দেয় গ্রীষ্ম। আবার সূর্য যখন উত্তর গোলার্ধে সরে আসে, সেখানে গরম পড়ে, দক্ষিণ গোলার্ধে পড়ে শীত।

পৃথিবীর অক্ষ তার পরিক্রমণ তলের দিকে গড়ে 23·5 ডিগ্রির মত ঝুঁকে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে, এই ঝুঁকে থাকাটা কখনো কমে, কখনো বাড়ে। কমতে কমতে এসে দাঁড়ায় 22·1 ডিগ্রিতে। বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় 24·5 ডিগ্রিতে। প্রতি 40,000 বছরে এই ঝুঁকে থাকাটা একবার কমে দাঁড়ায় 22·1 ডিগ্রিতে এবং বেড়ে দাঁড়ায় 24·5 ডিগ্রিতে। এছাড়া প্রতি 26,000 বছরে পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ একবার কম উপবৃত্তাকার হয়। একবার বেশি বৃত্তাকার হয়। এ সবের দরুন, পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে সূর্যের উত্তাপের ঘটে তারতম্য। এর জন্যেই কোথাও কখনো ঘটে অতিরিক্ত শীত, কোথাও অতিরিক্ত গ্রীষ্ম। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, পৃথিবীতে গত দশটি বরফ যুগ যে যে সময়ে এসেছিল, সেই সেই সময় পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ এবং তার অক্ষের তির্যকতা ওই তত্ত্ব অনুযায়ী বিরাজ করেছে। তাই তাঁরা মনে করছেন, মিলানকোভিচ্ যা বলতে চেয়েছেন, হয়ত সেটা সত্যি। পৃথিবীর বরফ যুগ নির্ভর করে পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ এবং তার অক্ষের তির্যকতার উপর।

(8 পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রফেসরের পদে যোগদান করার পর তিনি সরকারী চাকরী ছেড়ে দেন, কিন্তু তাঁর গবেষণার কাজ অ্যাসোসিয়েশনেই চলতে থাকে। অবশেষে 1928 সালে তিনি "রমন এফেক্ট" আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

ফাদার লাফোঁর উদ্যোগে অ্যাসোসিয়েশনে কিছুদিন জ্যোতির্বিজ্ঞানও পড়ানো হয়েছিল। এর জন্য 1880 সালে কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ বাহাদুর অ্যাসোসিয়েশনকে একটি 7-ইঞ্চি দূরবীন উপহার দেন। তাছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব কিছু যন্ত্রপাতিও কেনা হয়েছিল—তাদের মধ্যে ছিল সূর্যঘড়ি, বিভিন্ন ধরনের খ-গোলক ইত্যাদি। অ্যাসোসিয়েশনে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে বক্তৃতামালা শুরু করেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের মানমন্দিরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফাদার এ ডি পেনেরান্দা 1880 সালে। তিনি মাত্র এক বছর ক্লাশ নিয়েছিলেন। তারপর ফাদার লাফোঁ কিছুদিন চালিয়ে যান। কিন্তু বক্তার অভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্লাশ আর বেশিদিন চালানো সম্ভব হয় নি।

1947 সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অ্যাসোসিয়েশনে বহু পরিবর্তন আসে। 1952 সালে যাদবপুরের নতুন ভবনে চলে আসার পর 1953 সালে খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম ডিরেক্টর হয়ে আসেন। তিনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে গবেষণা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কেনার ও গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তারের এক পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তা কার্যকরী হওয়ার আগেই, 1956 সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বর্তমানে অ্যাসোসিয়েশনে প্রধানত পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মৌলিক গবেষণা চালানো হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে ঘনবস্তুর পদার্থবিদ্যা বর্ণালী বিশ্লেষণ, পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিদ্যা এবং কণিকা পদার্থবিদ্যা, সংশ্লেষিক ঔষধীয় জৈব রসায়ন অজৈব বস্তুর রসায়ন, লেজার রসায়ন ও লেজার বর্ণালী বিশ্লেষণ, পলিমার বিজ্ঞান এবং শর্করা রসায়ন ও তার প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর স্থাপনার পর দীর্ঘ 110 বছর কেটে গেছে। বৌবাজার স্ট্রীটের এক ছোট বাড়িতে যে অঙ্কুর জন্ম নিয়েছিল, আজ তা যাদবপুরের বিশাল সৌধরূপে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আজ এখানে গবেষণা চালিয়ে প্রতি বছর প্রায় 25 জন ছাত্র তাদের ডক্টরেট পাচ্ছে। হয়ত তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ বড় হয়ে এখানে গবেষণা শুরু করবে। তখন এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা যেন ভুলে যেও না।

7-UF, College Rd. New Delhi-1

ছুটির দিনের সাথী

সকাল থেকে উড়ছে ঘুড়ি চারটে, ছটা, আটটা,
হলদে সবুজ চাঁদিয়ালটা ওই দ্যাখো ভোকাট্টা!
ধরব বলে তাড়াতাড়ি উঠতে গেলাম গাছে,
হঠাৎ ডালের ঘষা লেগে কাটল হাঁটুর কাছে।
দেখলেই মা বকবে ভীষণ, ভয় তো কেবল তাই—
তার থেকে নয় আগেভাগেই বোরোলীন লাগাই।

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

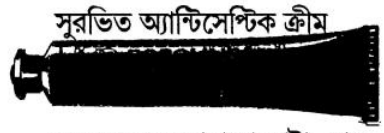

শুষ্ক ত্বকে ও সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০০৫৩

প্রসাধন সামগ্রী নয়

Response 1014

JAN/87.

শৈল চক্রবর্তী

কমিক মুখশ্রী!

কে বলেছে প্রকৃতিদেবী শুধু নানা রং দিয়ে ফুল প্রজাপতি আর পাখি তৈরি করেন? তিনি মাঝে মাঝে মজার সৃষ্টিও তৈরি করেন। এই মুখগুলি দেখে বলতো হাসি চাপা যায় কি?

বানরখেকো ঈগল

অস্ট্রেলিয়ান এম্যু

মাওরি কিউয়ি

ফ্লেমিং গো

মুকুটধারী বক

গ্রামোফোন আবিষ্কারের গল্প

দুলে দুলে পড়ছিল জিজা—'মেরি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব' মিঠে গলায় আদুরে আদুরে ক'রে। আমায় দেখেই পড়া ফেলে উঠে এল—'গল্প বলো, কাকু'। পড়ার সময় গল্প বলে পড়ার খেই হারিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল না আবার। তবু, হঠাৎ একটা মজার জিনিস মাথায় এল। বললাম 'তোর মেরি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব' নিয়ে একটা মজার গল্প আছে, জানিস।

'এডিসন প্রথম গ্রামফোন আবিষ্কার করেন। একটা ড্রামের চারদিকে একটা টিনের পাত জড়িয়ে নিলেন। হাতলটা ঘোরাতে ঘোরাতে স্পীকারে মুখ রেখে বললেন, 'মেরি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব'। হাতলটা একটু ঘোরাতেই কথাগুলো আবার শোনা গেল।

রেকর্ডের প্রতিটি খাঁজে যে কথাগুলো লুকিয়ে থাকে, সেগুলিই আমরা গ্রামোফোনে শুনতে পাই, ইলেকট্রিক মটরের সঙ্গে একটা টার্নটেবল লাগানো থাকে—তাতেই রেকর্ডটা ঘোরে। রেকর্ডের ওপর পিনটা ছোঁয়ালে সরু খাঁজগুলোর ভিতরকার কণা বৈদ্যুতিক শক্তি হিসেবে অ্যাম্প্লিফায়ারে গিয়ে পৌঁছোয়। যেখানে গিয়ে সেটা বেড়ে যায়, আর স্পীকার থেকে আমরা আওয়াজটা শুনতে পাই।

এত সব শোনার পরে জিজা কি বলল জান? 'কাকু এডিসন খালি 'মেরি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্বের' প্রথম লাইনটা বলল কেন। বাকিটা জানত না?"

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

ক্যুইজ কনটেস্ট

জানুয়ারী 1987 মান : VI—VIII

1. আসামের রাজধানীর নাম কি ?
2. 'ক্লে-পিজিয়ন' কথাটি কোন্ খেলার সঙ্গে জড়িত ?
3. পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোন্‌টি ?
   (ক) বৃহস্পতি (খ) শুক্র (গ) মঙ্গল
4. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূর্ব নাম কি ছিল ?
5. মানুষের মুখে ক'য় শ্রেণীর দাঁত থাকে ?
6. এক টুকরো সোনা পারদে ভাসবে, না ডুববে ?
7. কাগজ জৈব, না অজৈব পদার্থ ?
8. শিরার রক্তের রঙ কেমন হয় ?
9. কোন্ গ্যাস ক্ষারধর্মী ?
10. 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি কার লেখা ?
11. 'ইণ্ডিয়া হাউস' কোথায় অবস্থিত ?
    (ক) দিল্লী (খ) প্যারিস (গ) লণ্ডন
12. 'কিউই পাখি' কোন্ দেশে বাস করে ?

ফটো ক্যুইজ

জানুয়ারী 1987 মান : VI—VIII

নিচের বৃহৎ অট্টালিকাটি বিদেশে নয়—কলকাতার বুকেই অবস্থিত। একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের এই বাড়িটিতে তাদের অফিস সমূহও রয়েছে। বাড়িটার নাম এবং কোথায় অবস্থিত বলতে পারো ?

গত সংখ্যার সমাধান

	1 ফ্লো		2 বো	র	3 ন		4 ফে	
5 লি	ট	ম্যা	স		6 বে	কে	রে	ল
	ন		7 ন	8 ব	ল		ল	
9 সি		10 আ		ল		11 ই		12 জ্য
13 লি	থি	য়া	ম		14 নি	উ	ট্রি	ন
য়া		ন		15 সো		রে		ন
	16 কি		17 জে	না	18 র		19 শ	
20 নি	উ	ট	ন		21 জং	লা	ত	ঙ্ক
	রি		22 ন	য়	ন		ড্র	

অক্টো-নভেম্বর 86-সংখ্যায় প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সমাধান

1. অসমিয়া। 2. ফ্লোয়েম কলা। 3. আলেকজাণ্ডার। 4. ফ্রিগা দেবীর নামানুসারে। 5. ইটালীয় সাহিত্যিক জোভান্নী বোকাচিও। 6. 1858 খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া। 7. এক অসাধারণ প্রতিভাধর ভারতীয় বিজ্ঞানী। 8. পরমাণু। 9. আয়রন, নিকেল ও প্লাটিনাম ধাতু। 10 ইউরোপ। 11. কলকাতার ডালহৌসী ক্লাব।

জুনিয়র ফটো ক্যুইজ : পেণ্ডুলাম ঘড়ি।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই

মহাকাশবিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা-সুধাংশু পাত্র
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-73 দাম—10·00

পৃথিবী, মানুষ ও মহাকাশ। সুধাংশু পাত্র
পাত্রজ পাবলিকেশনস্ 2 শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-73

মহাকাশ নিয়ে পৃথিবীর মানুষের কল্পনা ও কৌতূহলের সীমা নেই। মহাকাশের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বিজ্ঞানীরা মহাউদ্যমে তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ, উপগ্রহ মারফত যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্কাইল্যাব—মহাকাশের গবেষণাগার এ সবই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যতম কল্যাণমূলক আবিষ্কার। প্রায় সমস্ত উন্নত এবং ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলিও মহাকাশ গবেষণার কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানকার বিজ্ঞানীরাও তাঁদের সর্বশক্তি ও মেধা নিয়োজিত করেছেন মহাকাশের বিভিন্ন রহস্য উদ্ঘাটনের কাজে। বাংলার কিশোরকিশোরীদের জন্য সাধু ভাষায় লেখা মহাকাশ বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থের খুবই অভাব লক্ষ্য করা যায়। সুলেখক সুধাংশু পাত্র এই দুরূহ কাজটি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে পালন করেছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। আকাশ ও মহাকাশের সীমারেখা টেনে দিয়ে গ্রন্থের সূচনা হয়েছে। মহাকাশের বিপদের কথাও বাদ দেওয়া হয়নি। এরপর একের পর এক বর্ণনা করা হয়েছে রকেটের ইতিহাস, রকেটের কার্যপ্রণালী জার্মানীর V_2-রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ, মানুষের মহাকাশযাত্রা ও চাঁদে অবতরণ ও সর্বশেষে সংযোগ করা হয়েছে মহাকাশ যাত্রার ভবিষ্যৎ। এই ধরনের একটি বিজ্ঞান গ্রন্থ ছোট বড় সকলকেই যে বিমল আনন্দ প্রদান করবে ও সেই সঙ্গে নতুন অনেক কিছু শেখা যাবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই লেখকেরই আর একটি গ্রন্থ 'পৃথিবী, মানুষ ও মহাকাশ'। গ্রন্থের কথক একজন বর্ষীয়ান দাদু। যিনি সারাটা জীবন বিজ্ঞান চর্চায় অতিবাহিত করে শেষ বয়সে ধর্মচিন্তায় মগ্ন হয়েছেন। আদরের পৌত্রীর আবদারে বাধ্য হয়েই রাজপুত্র, মন্ত্রী, দৈত্য-দানব রাক্ষস-খোক্কস্ ছেড়ে তাকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের গল্প ফাঁদতে হয়। পৃথিবীতে কি করে প্রাণের আবির্ভাব ঘটল, গাছপালা এল কেমন করে সূর্যের তাপ, তার তেজের উৎস ও মৃত্যু, ধূমকেতু সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্রের মৃত্যু—এইসব কথা সহজ গল্পের মতো করে শুনিয়েছেন লেখক। এই ধরনের বিজ্ঞান গ্রন্থ যখন গল্পচ্ছলে শিশু ও কিশোরদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়—তখন তার আবেদন যে সর্বজনীন হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে গ্রন্থে অনেক কথার পুনরুক্তি আছে—সেগুলি বাদ দিয়ে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটিকে আরও সংক্ষিপ্তায়তন করার প্রস্তাব রইল।

পার্থসারথি চক্রবর্তী

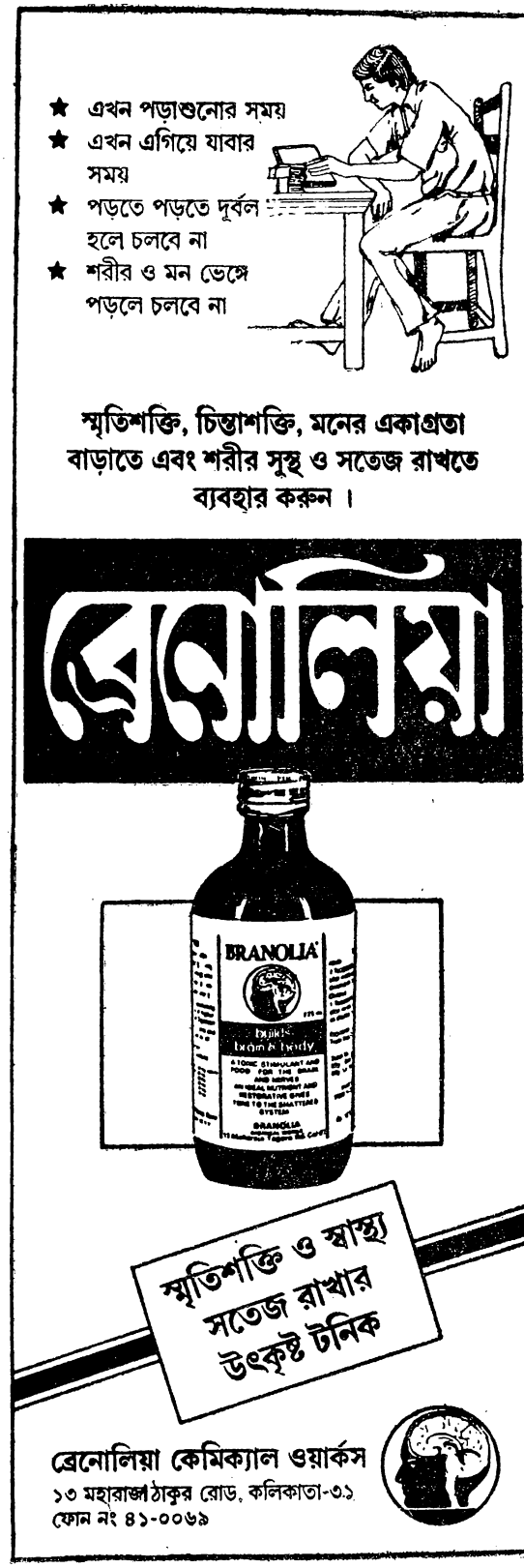

মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট

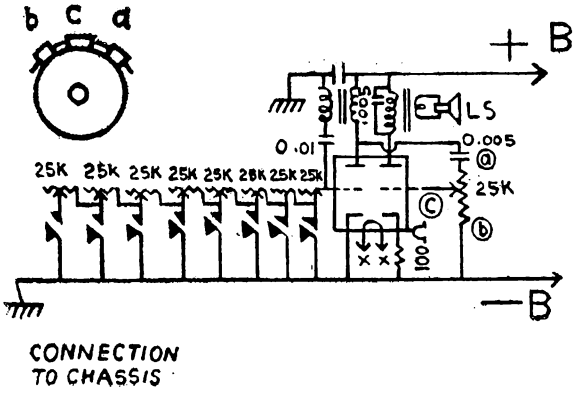

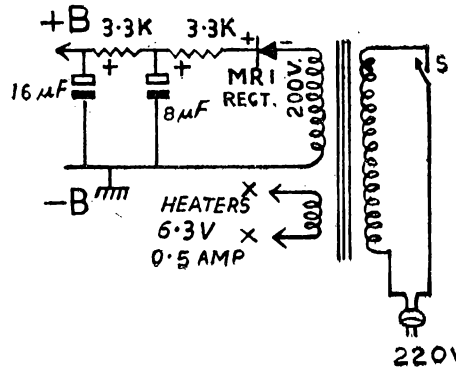

ইলেকট্রিক হারমোনিয়াম

এবারকার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট যারা গান-বাজনা ভালবাসো তাদের জন্য লেখা হয়েছে। এটাকে তুমি ইলেকট্রিক পিয়ানোও বলতে পার। এই মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট তৈরি করতে খুব একটা বেশি খরচও হবে না, আর যদি তোমার বাড়িতে একটা AC রেডিও থাকে তাহলে নামমাত্র খরচে এটা তৈরি করা যাবে।

এখানে সমস্ত সার্কিটের মধ্যে একটা মাত্র ভাল্‌বই রয়েছে ECC 83, এটা হচ্ছে ডাব্‌ল ট্রায়োড ভাল্‌ব। এই ট্রায়োড ভাল্‌বই তোমাকে নানাধরনের tone-এর সুরঝংকার শোনাবে। অবশ্য যদি তুমি সার্কিট ডায়াগ্রামের মতো ঠিক করে ইলেকট্রনিক উপকরণগুলি সাজাতে পার। প্রথম ট্রায়োডে একটা inter-stage অডিও ট্রান্সফরমার 1 : 3 এই অনুপাতে প্লেট সার্কিটে ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রিডের আটটা 25K ওহম ভ্যারিয়েবল রেজিসটর থাকবে। তুমি বিভিন্ন সুইচে চাপ দিলে (এটা একটা পুরনো খেলনা পিয়ানো থেকে তৈরি করে নিতে পারো) রেজিসটরের বিভিন্ন মান কাজ করতে থাকবে Grid leak হিসাবে। তাই প্রত্যেকটা সুইচ থেকেই আলাদা টোন-এর ঝংকার বেরোতে থাকবে। তুমি ভ্যারিয়েবল রেজিসটরকে গ্রীড-এর সবচেয়ে কাছে Set করতে পার। ঠিক হারমোনিয়ামের সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-এর মতো সুর বেরোচ্ছে কিনা তা সঙ্গীতজ্ঞের সাহায্য নিয়ে জেনে নিতে পারো। অবশ্য তুমি নিজের কানে শুনেও এটা বুঝতে পারবে। এখানে কোন জিনিসটা কি কাজ করছে সেটা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়—প্রথম ট্রায়োড কাজ করছে অসিলেটরের ন্যায় আর দ্বিতীয় ট্রায়োড কাজ করছে অ্যামপ্লিফায়ারের মতো।

পাওয়ার সাপ্লাই যন্ত্র তৈরি হয়েছে Mains ট্রান্সফরমার, একটি রেকটিফায়ার এবং একটি ফিল্টার সার্কিট দিয়ে। এই Power অবশ্য তুমি একটা AC রেডিও সেট থেকেও কায়দা করে নিতে পার, অসুবিধা নেই। একটা Contact-Cooled রেকটিফায়ার (MRI), Eec 83 ভাল্‌বের কারেণ্ট সাপ্লাই করবার পক্ষে যথেষ্ট। ছোট Mains ট্রান্সফরমার-এর একটা প্রাইমারী (220 – 0 ভোল্ট) এবং একটা সেকেণ্ডারী (0 – 200 ভোল্ট) 20 mA এবং 6·3 ভোল্ট 5 এ্যাম্পিয়ার থাকবে। দুটো ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর 16μF ও 8μF ফিল্টার সার্কিটে যোগ করতে হবে। আরও ভাল এবং সুন্দর tone-এর জন্য hi-fi অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করতে পার, অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটের সঙ্গে ভল্যুম কণ্ট্রোল সুইচের প্রান্ত দেশ জুড়ে দিয়ে (পয়েণ্ট a ও b)।

কি কি জিনিস চাই

রেজিসটর : ভ্যারিয়েবল রেজিসটর, 25k ওহম প্রত্যেকটা—আট পিস ; ভল্যুম কণ্ট্রোল 250k ওহম (অন/অফ্ সুইচ সহ) ; 3·3k ওহম দুটো ; 100 ওহম একটা ; ক্যাপাসিটর 0·01μF, 250V দুটো ; 0·005μF 250V—দুটো ; 16μF 350V, ইলোকট্রোলাইটিক—একটা ; ভাল্‌ব : Ecc 83 ; রেকটিফায়ার M R I, Contact-Cooled রেকটিফায়ার, 250V, 20mA ; ট্রান্সফরমার ; TI, interstage অডিও ট্রান্সফরমার, অনুপাত 1 : 3 T_2, ছোট আউটপুট ট্রান্সফরমার, প্রাইমারী Mains এর জন্য ; সেকেণ্ডারী 200V, 20mA এবং 6·3V, 0·5 এ্যাম্পিয়ার। এছাড়া লাউড স্পীকার, স্ক্রু, চ্যাসিস, বিভিন্ন রং-এর তার, নব্ পিয়ানো সুইচ, একটা সুন্দর ক্যাবিনেট ইত্যাদি।

পার্থসারথি চক্রবর্তী

পড়াশোনা

চাঁদার সাহায্য ছাড়া কোণ অঙ্কন

সজল চক্রবর্তী

তোমরা 18°, 36°, 54°……কিভাবে আঁকবে আমি এখানে সেটাই শিখিয়ে দিচ্ছি—

প্রথমে একটা সরলরেখা AB আঁকো। এবার AB-র যে-কোন প্রান্তে (ধরো A-প্রান্তে) একটি লম্ব AY আঁকো। এখন AB-র অর্ধেক-এর সমান করে AC-অংশ কেটে নাও। BC-যোগ করো। এইবার C-বিন্দুকে কেন্দ্র করে AC ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্তচাপ এঁকে নাও। এই চাপ BC-কে D-বিন্দুতে ছেদ করলো। এখন 'B' কে কেন্দ্র করে BD ব্যাসার্ধ নিয়ে আরেকটি বৃত্তচাপ আঁকো। এই চাপটা AB-কে E-বিন্দুতে ছেদ করলো। এখন 'A' এবং 'E' কে কেন্দ্র করে BE ব্যাসার্ধ নিয়ে দুটো বৃত্তচাপ আঁকো। AB-র নিচে এই দুটো চাপ 'F' বিন্দুতে ছেদ করলো। এবার 'AF' ও 'EF' যোগ করো।

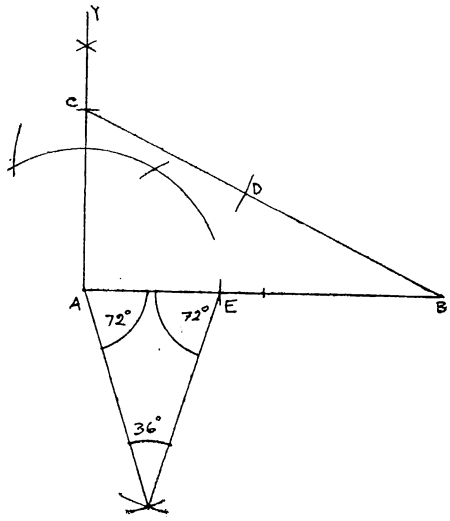

এখন চাঁদা দিয়ে মেপে দেখো ঃ—

দেখবে যে—

$\angle F = 36°$, $\angle E = \angle A = 72°$

এবার খুব সহজেই 9°, 18° 54° কোণগুলি এঁকে নিতে পারবে।

একবার এঁকে দেখো—বেশ মজা পাবে।

3-K, নস্কর পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কল-৬

পৃথিবীকে আরও জানার সুযোগ

নবপ্রবর্তিত পাঠক্রম অনুযায়ী একমাত্র

সহযোগী পুস্তক

বৈশিষ্ট্য ঃ

- নবপ্রবর্তিত পাঠক্রমের সামগ্রিক আলোচনা
- তথ্য ও তত্ত্বের সামুজ্য
- সহজবোধ্য ও সর্বাধিক তথ্যপূর্ণ
- উপযোগী বিষয়ের আলোচনা
- সর্বাধুনিক তথ্যপঞ্জী
- আন্তর্জাতিক চিহ্ন ও বর্ণের ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের একমাত্র মানচিত্রাবলী

ঃ পরিবেশক ঃ

এডুকেশন্যাল এণ্টারপ্রাইজ

২ রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৯

উদ্ভিদকলা

দিনোজকুমার দে

প্রাণীদের মত উদ্ভিদদেহও কলা দিয়ে গঠিত। অবশ্য এককোষী উদ্ভিদের দেহে কোন কলা থাকে না কারণ তাদের দেহ একটি মাত্র কোষ দিয়ে তৈরি এবং ঐ একটি কোষই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জৈবনিক কার্য করে। বহুকোষী উদ্ভিদদের দেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি এবং ঐ কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে হয়ে নতুন নতুন কোষ উৎপন্ন করে। উৎপাদিত কোষগুলির মধ্যে যেগুলির উৎপত্তি মূল এক এবং কাজও এক সেই কোষ সমষ্টিকে বলা হয় কলা।

উদ্ভিদ কলা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ভাজক কলা ও স্থায়ী কলা। ভাজক কলার কোষগুলি বিভাজন ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ উৎপন্ন করে। ভাজক কলার কোষগুলি বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন ডিম্বাকার, গোলাকার ও বহুভুজাকার। এই কলায় কোন কোষান্তর রন্ধ্র থাকে না। কোষগুলির কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত হলেও খুব পাতলা। কোষের দানাদার সাইটোপ্লাজমে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস ও বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর দেখা যায়। ভাজক কলা দেখা যায় উদ্ভিদের সব বর্ধনশীল অঙ্গে অর্থাৎ পাতা, কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে। কাণ্ডের দুটি পর্বের মাঝখানেও এদের দেখা যায়। এমন কি এই কলা কাণ্ডের পরিধিতেও দেখা যায়। ভাজক কলার কাজ উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটানো। মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত ভাজক কলাকে বলা হয় আদিভাজক কলা বা মূল ভাজক কলা। ভাজক কলাকে কয়েকটি দিক দিয়ে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। উৎপত্তি অনুযায়ী ভাজক কলা মোটামুটি দুই প্রকার। প্রাথমিক ভাজক কলা ও গৌণ ভাজক কলা। প্রাথমিক ভাজক কলার কোষগুলি সৃষ্টি হয় আদিভাজক কলা থেকে। এই ভাজক কলার কোষগুলি মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বিভাজিত হতে পারে। তাই তাদের মূল কাণ্ড ও পাতার অগ্রভাগে দেখা যায়। উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধির জন্য কখনও কখনও স্থায়ী কলা ভাজক কলায় রূপান্তরিত হয়। এইরকম রূপান্তরিত ভাজক কলাকে বলা হয় গৌণ ভাজক কলা। কর্ক ক্যাম্বিয়াম ও ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম গৌণ ভাজক কলার উদাহরণ। অবস্থান অনুসারে ভাজক কলা তিন প্রকার। যথা অগ্রস্থ ভাজক কলা, পার্শ্বস্থ ভাজক কলা ও নিবেশিত ভাজক কলা। অগ্রস্থ ভাজক কলা উদ্ভিদ দেহকে লম্বায় বাড়ায় এবং এই কলা মূল ও কাণ্ডের শীর্ষভাগে অবস্থিত। পার্শ্বস্থ ভাজক কলা মূল ও কাণ্ডকে পরিধিতে বাড়ায়। এই কলার অবস্থান মূল ও কাণ্ডের পরিধিতে। নিবেশিত ভাজক কলা দুটি স্থায়ী কলার মাঝখানে থেকে উদ্ভিদের কাণ্ডকে লম্বায় বাড়ায়। এই কলা ইক্যুইজিটাম ও পাইন উদ্ভিদের পত্র মূলে দেখা যায়। কার্য অনুযায়ী ভাজক কলা তিন-প্রকার। প্রোটোডার্ম বা ডারমাটোজেন, প্রোক্যাম্বিয়াম বা প্লিরোম এবং গ্রাউন্ড মেরিস্টেম বা পেরিব্লেম। মূল ও কাণ্ডের একেবারে বাইরের স্তরকে বলা হয় বহিঃত্বক। ভাজক কলার যে অংশ এই বহিঃত্বক বাধনে সাহায্য করে সেই ভাজক কলাকে বলা হয় প্রোটোডার্ম বা ডারমাটোজেন। এই কলা এক কোষস্তর বিশিষ্ট। অগ্রস্থ ভাজক কলার কিছু অংশ প্রাথমিক সংবহন কলা উৎপন্ন করে। এই প্রকার অগ্রস্থ ভাজক কলাকে বলা হয় প্রোক্যাম্বিয়াম। প্রোক্যাম্বিয়াম বা প্লিরোম এক বীজপত্রী ও দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে দেখা যায়। বহিঃস্তর বা কর্টেক্স এবং মজ্জা তৈরি হয় অগ্রস্থ ভাজক কলার যে অংশ থেকে তাকে বলে গ্রাউন্ড মেরিস্টেম বা পেরিব্লেম। গ্রাউন্ড মেরিস্টেম মজ্জা রশ্মি গঠনেও সাহায্য করে। কোষ বিভাজন তল অনুসারে ভাজক কলা তিন ভাগে বিভক্ত। মাস মেরিস্টেম বা পুঞ্জ-ভাজক কলা, প্লেট মেরিস্টেম বা চেটাল ভাজক কলা ও রিব মেরিস্টেম বা পর্শুকা ভাজক কলা। মাস মেরিস্টেম বা পুঞ্জ ভাজক কলার কোষ বিভাজন সর্বতলে ঘটে থাকে। এইভাবে বিভাজিত কোষগুলি কোন নির্দিষ্ট নিয়মে অবস্থান না করে যে কোষপুঞ্জ তৈরি করে তাকে বলে মাস মেরিস্টেম বা পুঞ্জ ভাজক কলা। রেণুস্থলীতে, বর্ধনশীল ভ্রূণে, মজ্জায়, সস্যে প্রভৃতি জায়গায় এই কলা দেখা যায়। প্লেট মেরিস্টেম বা চেটাল ভাজক কলার কোষগুলি নির্দিষ্ট দুইটি তলে বিভাজিত হয়। ফলে কোষগুলি একস্তরে অবস্থিত হয়ে চেটাল আকৃতি লাভ করে। বর্ধনশীল বহিঃস্তককে এই প্রকার কলা দেখা যায়। রিব মেরিস্টেম বা পর্শুকা ভাজক কলার কোষগুলি একটি মাত্র তলে বিভাজিত হয়।

জীবন বিজ্ঞান বিষয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি-মূলক আলোচনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

যে কলার কোষগুলির বিভাজন ক্ষমতা থাকে না বা বিভাজিত হতে পারে না, সেই কলাকে বলা হয় স্থায়ী কলা। প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী কলা বিভাজন ক্ষমতা হারানো ভাজক কলা। স্থায়ী কলার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান। স্থায়ী কলার কোষগুলির কোষ প্রাচীরে নানারূপ নক্শা দেখা যায়। এই কলার কোষগুলি জীবিত অথবা মৃত হতে পারে। মৃত কোষগুলির মধ্যে প্রোটিপ্লোজম থাকে না। স্থায়ী কলা তিন প্রকার। সরল কলা, জটিল কলা ও বিশিষ্ট কলা।

প্রাচীন ভারতের কারিগরী শিল্প

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে কারিগরী শিল্পের প্রসার ঘটে। প্রাচীন ভারতে কারিগরী শিল্প যে কত উচ্চ-মানের ছিল, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে দিল্লীতে কুতুবমিনারের পাশে অবস্থিত সুউচ্চ লৌহ স্তম্ভটি যার গায়ে বহু শতাব্দী পার হয়ে আজও একবিন্দু মরিচা ধরে নি।

বিজ্ঞানচর্চা ও কারিগরী বিদ্যায় ভারতের উন্নতির সূচনা সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে। ইতিহাসে এই সভ্যতা হরোপ্পার সভ্যতা (২৩০৫-১৭৫০ খৃস্টপূর্ব) রূপে পরিচিত। প্রত্ন-তাত্ত্বিক খননের ফলে সিন্ধু প্রদেশের হরোপ্পা-মহেঞ্জদড়োতে যে নগর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় সে সময়কার ভারতীয় কারিগরেরা নগর পরিকল্পনায় ও স্থাপত্যে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। শহরে ইমারত রচনায় তাঁদের নিপুণ জ্যামিতিক জ্ঞান এবং রাস্তাঘাট নির্মাণে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় মেলে। সে সময় জলনিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ইমারত গড়তে তখন পোড়া মাটির ইঁট ব্যবহার করা হত। ইঁটের আকার ও গঠন দেখে বোঝা যায়, তৎকালীন ভারতীয় কারিগাররা একই রকম মান বজায় রাখতে জানতেন এবং ইঁট পোড়াবার কারিগরী বিদ্যা দক্ষভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। মহেঞ্জদড়ো-হরোপ্পায় যে সব মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয়, ভারতীয় কারিগরেরা তখন মৃৎপাত্রাদি তৈরিতেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

কোথায়, কখন ও কিভাবে লোহার ব্যবহার শুরু হয় তা আমরা জানি না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, খৃস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের আগেই ভারতীয় কারিগরেরা লোহা গলাবার ও ঢালাই-এর পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা যে এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুতুবমিনারের পাশে ২৪ ফুট উঁচু ও প্রায় ৬ টন ওজনের লৌহস্তম্ভটি। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে এটি কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আজও নিষ্কলঙ্ক রূপে দাঁড়িয়ে আছে। এটিই শুধু একমাত্র নিদর্শন নয়, উড়িষ্যার কোনারকে সূর্যমন্দিরেও অনুরূপ নিষ্কলঙ্ক লৌহ-দণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়।

কেবল লোহা নয়, তামা, টিন, সীসা ইত্যাদি ধাতু এবং ব্রোঞ্জ, পিতল ইত্যাদি সংকর ধাতু ব্যবহারেও প্রাচীন ভারতীয় কারিগরেরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়েন সাঙ্ তাঁর ভারত ভ্রমণের বিবরণীতে লিখে গেছেন, সে সময় ভারতে পিতলের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। রাজা হর্ষবর্ধনের কালে (৬০৬—৬৪৭ খৃস্টাব্দ) নির্মিত একটি বিরাট তামার বুদ্ধমূর্তি এবং একটি পিতলের মন্দিরের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ ভাবে সে সময় কারু কার্যময় মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। অভ্রের গুঁড়ো মিশিয়ে তখন এক বিশেষ ধরনের চকচকে মৃৎপাত্র প্রস্তুত হত।

সে সময় অন্যান্য যে সব ধাতুর ব্যাপক প্রচলন ছিল তা হলো তামা, টিন, সোনা, রূপা ও সীসা। এইসব ধাতু দিয়ে বাসনকোসন, গহনা, যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হত। ব্রোঞ্জ ও পিতল সংকর ধাতুর ব্যবহারও ছিল খুব। তামা, টিন ও সীসার 'বিদারি' নামে একটি সংকর ধাতু সৌখীন জিনিসপত্র তৈরি করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত।

তামার পাত্রকে টিনের প্রলেপ দেবার পদ্ধতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাদশা আকবরের রাজ পরিবারে তামার পাত্রাদিকে টিনের প্রলেপ দেওয়া হত।

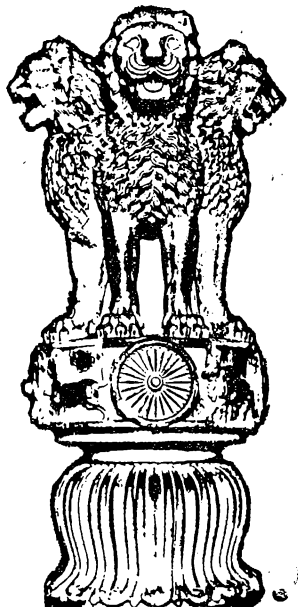

মোঘল সম্রাটদের আমলে কামান ও বন্দুক তৈরি করতে ধাতুর বিশেষ ব্যবহার ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভারী কামান তৈরি হত ভারতে। সে সময় আহমেদনগরে ব্রোঞ্জে ঢালাই করা 'মালিক ময়দান' কামানটির খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয়

কারিগরেরা তখন যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে রকেটও তৈরি করতে জানতেন। তাঁরা বাঁশ দিয়ে এই রকেট তৈরি করতেন। এই রকেটে দাহ্য বারুদ ভরা লোহার নল লাগানো থাকত। এই রকেট যুদ্ধের কাজে বিশেষ ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় কারিগরেরা পণ্যবাহী বড় বড় জাহাজ ও নৌকো নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁরা ইউরোপীয় ধাঁচে জাহাজ তৈরি করতে থাকেন। তাঁদের তৈরি এইসব জাহাজ ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডে তৈরি অনুরূপ জাহাজের চেয়ে অনেক দিক থেকে ভালো ছিল।

ভারতীয় সুতীবস্ত্রের খ্যাতি বহু প্রাচীন কাল থেকে। ঢাকার অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের খ্যাতি তো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল একসময়। কাঠের ব্লকে নকশা ছাপানো ও রঙকরা ভারতের সুতীবস্ত্র এশিয়ার বহু দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হত। শুধু সুতীবস্ত্র নয়, সিল্ক বা রেশমের তৈরি ভারতীয় বস্ত্র নানাদেশে সমাদর লাভ করে।

আমীর খুসরুর বিবরণ থেকে জানা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে কাগজশিল্প গড়ে উঠে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি এদেশে কাগজের এত প্রচলন হয় যে দিল্লীর মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারকেরা কাগজে মুড়ে মিষ্টান্ন খদ্দেরদের দিতেন। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে কাশ্মীরে আকর্ষণীয় মানের কাগজ প্রস্তুত হত। এরপর আমেদাবাদ, জাফরাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও মহীশূরে কাগজ শিল্প গড়ে ওঠে। মোঘল আমলে রাজকার্যে কাগজের ব্যবহার এত বেড়ে যায় যে তাঁদের প্রশাসনকে 'কাগজী রাজ' বলা হত।

ভারতে সুগন্ধি দ্রব্য ও ভেষজ শিল্পের প্রসার বহু প্রাচীনকালেই ঘটে। ভারতীয় কারিগরেরা উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করতে জানতেন। কুটির শিল্প স্তরে এইসব সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হত এবং জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করে। দেশীয় গাছগাছড়া থেকে নানারকম আয়ুর্বেদীয় ভেষজ ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রস্তুত হত। আস্ত্রিক রোগ, চক্ষু রোগ, রক্তচাপ কমাবার যে সব ভেষজ এভাবে প্রস্তুত হত সেগুলি বিশেষ ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয়। মোঘল আমলে ইউনানী পদ্ধতিতে ভেষজ প্রস্তুতের প্রসার ঘটে।

স্থাপত্য শিল্পে ভারতীয় কারিগরদের পারদর্শিতার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। আগ্রার তাজমহল তো স্থাপত্যের এক পরম বিস্ময়! তাজমহলের রূপকার ছিলেন ওস্তাদ আহমদ অল মিমার লাহোরী (যার ভাষাগত অর্থ হলো লাহোরের সেরা স্থাপতি যন্ত্রকুশলী আহমদ)। ওস্তাদ আহমদ শুধু অনন্য স্থপতি ছিলেন না, গণিত ও জ্যামিতি বিদ্যায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং এবিষয়ে তিনি কয়েকটি মূল্যবান বইও লিখেছিলেন।

ভারতীয় স্থপতিরা পাথর ও ইঁট উভয়েরই ইমারত গড়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাংলা থেকে সিন্ধুপ্রদেশ এবং কাশ্মীর থেকে কন্যা-কুমারী পর্যন্ত ভারতের নানা প্রান্তে তাঁদের স্থাপত্যের বহু অনুপম নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁরা বিশেষ ধরনের ইমারত গড়েছিলেন। প্রতিরক্ষার জন্য যেমন সুরক্ষিত দুর্গ গড়েছেন, তেমনি আবার অপূর্ব কারুকার্যময় মন্দির, মসজিদ, সমাধিক্ষেত্র ও রাজপ্রাসাদ গড়েছেন। তাঁদের রচনা শৈলীতে প্রয়োজনভিত্তিক ইমারত গড়ার সঙ্গে নান্দনিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। যা দর্শককে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। শুধু সুরম্য ইমারত গড়া নয়, ভারতীয় স্থপতিরা মনোহর উদ্যান নির্মাণেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মোঘল আমলে সুন্দর সুন্দর ফোয়ারা সমেত নয়নবিমোহন বহু উদ্যান নির্মিত হয়েছিল। কাশ্মীরের শালিমার উদ্যান, লাহোরের গোঙ্কাপ উদ্যান, বাঙ্গালোরের লালবাগ উদ্যান যাঁরা দেখেছেন তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি।

কারিগরী শিল্পের নানাক্ষেত্রে প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা যে সব অনন্য অবদান রেখে গেছেন তাতে আমরা সত্যি গর্ব ও গৌরব বোধ করতে পারি।

শীগগীর প্রকাশিত হবে

আচার্য সত্যেনাথ বসুর

কিশোর রচনা সঙ্কলন

সঙ্কলন ও সম্পাদনা : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-9

কুরী এবং রেডিয়াম

পৃথ্বীজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে সবচেয়ে দামী জিনিস বলতে সোনার কথাই সর্বাগ্রে আমাদের মনে আসে। কিন্তু সোনার চেয়েও অনেক দামী একটা জিনিস আজ বিজ্ঞানের দৌলতে আবিষ্কৃত হয়েছে। তোমরা যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা কর, তারা নিশ্চয়ই জিনিসটি কি তা ধরতে পেরেছ! সোনার চেয়েও দামী সেই জিনিসটি হল রেডিয়াম। যার প্রতি গ্রামের দামই প্রায় লক্ষ টাকার ওপর। পৃথিবীর সব চাইতে দামী এই ধাতুটি আবিষ্কার করেছিলেন পোল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরী।

মেরী স্কলডোয়াস্কা কুরী 1867 সালে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন ওয়ারশ-এর একটি স্কুলের বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক। স্কুলটির আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে, মেরী কুরীর পিতাকেই অনেক সময় নিজের পয়সা দিয়ে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কিনে নিতে হত। মেরী কুরী দিনের বেলায় স্কুলে যেত, আর সন্ধ্যাবেলায় তার বাবার বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে বাবাকে নানাভাবে সাহায্য করতো। যে সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে সেই সময়ে ছোট্ট দেশ পোল্যাণ্ডের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। পার্শ্ববর্তী দেশ রাশিয়ার জার পোল্যাণ্ডের সাধারণ নিরীহ অধিবাসীদের ওপর তখন ভীষণ অত্যাচার করতো। তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল জোর করে। শুধু তাই নয়, পোল্যাণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতেও জোর করে রাশিয়ান ভাষা শেখানো হত। মেরীর বাবা কিন্তু বেশ স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। রাশিয়ানদের অত্যাচার তার কাছে অসহ্য লেগেছিল। তাই পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই কারণে তাকে স্কুলের চাকরিটি হারাতে হল। একেবারে অথৈ সাগরে পড়লেন স্কলডোয়াস্কা পরিবার।

যাই হোক, স্কুলের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর মেরী তার দিদির উচ্চশিক্ষার খরচ জোগানোর জন্য ওয়ারশ-এর একটি পরিবারে গভর্নেসের চাকরি নেন। সংসারে দারিদ্র্যের জন্যই মেরীকে সেদিন সামান্য গভর্নেসের চাকরিও করতে হয়েছিল। এই সময়ে মেরীর জীবনে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। মেরী যে বাড়িতে গভর্নেসের কাজ করতেন, সেই বাড়ির বড় ছেলের সঙ্গে মেরীর পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ছেলেটি উচ্চশিক্ষার্থী—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বেশ ভদ্র ও রুচিশীল। মেরী আর ছেলেটির মধ্যে ভালবাসা গড়ে ওঠার পর তারা একে অপরকে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হল। কিন্তু গোলবাধালেন ছেলেটির মা। বড় ছেলের সঙ্গে একটা সামান্য গভর্নেসের বিয়ে দিতে তিনি কিছুতেই রাজী ছিলেন না। এই দুঃসংবাদে চরম হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন মেরী। ঠিক করলেন, আত্মহত্যা করবেন। চিঠি লিখলেন—'আমি এই ঘৃণ্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি না থাকলেও কারও কোন ক্ষতি হবে না' ……ইত্যাদি।

মাদাম কুরী

বোঝ অবস্থা! গোটা মানব সমাজের সেবা করার জন্য যার জন্ম সেই কিনা বলে—আমি না থাকলেও কারও কোন ক্ষতি হবে না? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অশেষ সৌভাগ্য যে, মেরী তার আত্মহত্যার সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করেননি। যদি তাই করতেন, তবে, বোধহয়—বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই—পৃথিবীর বিজ্ঞান ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। আধুনিক বিজ্ঞানের যে চরম উন্নতি আজ সাধিত হয়েছে, তাও অনেক পিছিয়ে পড়ত এই কারণে।

যাই হোক, মেরীর যখন 23 বছর বয়স, সেই সময় তিনি প্যারিসের সোরবনের বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হন। ছোটবেলায় বাবার বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে কাজ করবার সময়েই মেরী ঠিক করেছিলেন বিজ্ঞানী হবেন। মানুষের সেবায় বিজ্ঞানের সাহায্যেই তিনি লক্ষপথে এগিয়ে যাবেন। তাই প্যারিসের বিজ্ঞান কলেজে পড়বার সময় বাসস্থানের যে তীব্র অসুবিধা ও দুর্ভোগ তাকে ভোগ করতে

হয়েছিল,—তাতেও তিনি পিছপা হননি। প্যারিসে তাকে পড়াশোনার খরচ জোগাতে নানাভাবে বাড়তি পরিশ্রম করতে হোত। দিনের বেলায় কলেজের পড়া শেষ করে রাতের বেলায় তাকে যেতে হোত ল্যাবরেটরিতে শিশি বোতল ধোঁয়ামোছার কাজে। এত কষ্টের মধ্যেও কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল, পদার্থবিদ্যায় তিনি প্রথম হয়েছেন। পরের বছরও তিনি অঙ্ক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়েই মেরীর সঙ্গে পিয়ের কুরী নামে এক বিজ্ঞানীর আলাপ হয়। পিয়ের কুরী পদার্থ বিদ্যায় গবেষণা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর পিয়ের কুরী চুম্বক বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পড়াশোনার পাট শেষ করে যে অধ্যাপকের ল্যাবরেটরীতে মেরী গবেষণা শুরু করেছিলেন, সেখানেই পিয়েরের সঙ্গে তার আলাপ হয়। পিয়ের কুরী তার গবেষণার জন্য মেরীকে তার সহযোগী করে নিয়েছিলেন। 1895 সালে তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু পিয়ের কুরী অত্যন্ত স্বল্প বেতনে অধ্যাপনা করতেন বলে তাদের সংসারে কম অভাব ছিল না, কিন্তু তারা উভয়েই তা' মানিয়ে নিয়েছিলেন।

যে বছর পিয়ের কুরীর সঙ্গে মেরীর বিয়ে হয়, সেই বছরেই জার্মান বিজ্ঞানী রনটপেন এক্স রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন। হেনরি বেকরেল নামে এক বিজ্ঞানী সেই সময় রনটপেনের আবিষ্কৃত ধারাতেই গবেষণা শুরু করেন। গবেষণা করতে করতে একদিন বিজ্ঞানী বেকরেল দেখতে পান ইউরেনিয়াম সালফেট নামে এক রকম ধাতব লবনের গা থেকেও এক্স-রশ্মির অনুরূপ তেজবের হয়।

রনটেগেন

পিয়ের ও মেরী অধ্যাপক বেকরেলের গবেষণায় আকৃষ্ট হয়ে তাদের আগের গবেষণা বাতিল করে নতুন গবেষণা শুরু করলেন। বিজ্ঞানী রনটনে ও বেকরেলের আবিষ্কৃত পথেই তাদের গবেষণা শুরু হয়। ইউরেনিয়াম জিনিসটি পাওয়া যেত পিচব্লেন্ড এক রকম খনিজ পদার্থ থেকে। এখন, গবেষণার জন্য প্রচুর পিচব্লেন্ড প্রয়োজন। অস্ট্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোন দেশেই তখন পিচব্লেন্ড পাওয়া যেত না। দামও বেশি। অথচ, ইউরেনিয়াম ছাড়া পিচব্লেন্ড আর কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে কিনা তা গবেষণা করতে হলে প্রচুর পিচব্লেন্ডের দরকার। শেষ পর্যন্ত মেরী ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের পর যে পিচব্লেন্ড অস্ট্রিয়া সরকার আবর্জনা হিসাবে ফেলে দেয়, তাই পাওয়ার জন্য অস্ট্রিয়া সরকারের কাছে আবেদন করলেন। বলা বাহুল্য, মেরীর গবেষণার বিষয় ও কার্যপদ্ধতি জেনে অস্ট্রিয়া সরকার জাহাজে একটন পিচব্লেন্ড পাঠিয়ে দেন তাদের।

পিচব্লেন্ড তো পাওয়া গেল, কিন্তু সেই প্রচুর পরিমাণ জিনিস রাখাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কারণ, মেরী আর তার স্বামী পিয়ের কুরী প্যারিসে যে ছোট্ট ঘরটিতে থাকতেন সেখানে বাড়তি জায়গা একটুও ছিল না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা যে ঘরে থাকতেন তার পিছনের একটা চালাঘরে পিচব্লেন্ড রাখার ব্যবস্থা হল। এই চালাঘরটিকেই তারা তাদের পরীক্ষাগার বানিয়ে নিয়েছিলেন। ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ত, মেঝেও পাকা ছিল না। ঘরে আসবাবপত্র বলতে ছিল শুধু দুটো নড়বড়ে টেবিল। শীতকালে কুরী দম্পতি সেখানে প্রায় জমে যেতেন, আর গরমকালে তাদের দমবন্ধ হয়ে আসত। এই চরম অবস্থার মধ্যেও 1898 সাল থেকে 1902 সাল পর্যন্ত তারা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেখানে গবেষণা করেছিলেন। পরে মেরী কুরী যখন একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, তখন একদিন বলেছিলেন যে, জীবনের এই সময়টিই তাদের সবচেয়ে আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটেছে।

1898 সালের জুলাই মাসে একদিন মেরী ঘোষণা করলেন যে, পিচব্লেন্ডের মধ্যে ইউরেনিয়াম ছাড়াও আরও একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে। তিনি সেই পদার্থটির নাম দিলেন 'পলোনিয়াম'। নিজের ফেলে আসা প্রিয় জন্মভূমি পোল্যাণ্ডের নাম অনুসারে।

পিচব্লেন্ড নিয়ে মেরী ও তার স্বামী পিয়েরী কুরী কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন, তা কিন্তু ওই পলোনিয়াম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল না। বরং নতুন পদার্থ আবিষ্কার করায় তারা আরও নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কয়েক বছর ধরে তারা গবেষণায় মগ্ন হয়ে রইলেন। শেষে পাওয়া গেল বিশ্ববিজ্ঞানের জগতে সেই অমূল্য বস্তু 'রেডিয়াম'।

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

কিনে নিলে তো আমার আবিষ্কারের মৌলিকতা থাকে না চাঁদু। তবে এর সঙ্গে আরও আছে— ছাতা।
ছা-তা!
আমার কাজ ফিনিশ। এবার তোকে দিয়েই এটা পরখ করবো ঠিক যুগোপযোগী হবে কিনা। নে-চটপট এটা পায়ে গলিয়ে নে।
আ-আ-আ আমাকে কেন এর মধ্যে টানাটানি করছিস?
এবার ফোল্ডিং ছাতাটা ঠিক করে বাগিয়ে ধরে সুইচটা টেপ।
ওরে, আমি তো দাঁড়াতেই পারছি না!
চমৎকার! এবার পালে হাওয়া লাগলেই—
ফটাং
ওরে বাবারে! এ আমাকে হড়কিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছিস! আমাকে ধর!
এই হল আমার স্বয়ংক্রিয় চলন্ত জুতো। নো জ্বালানী, নো সোলার এ্যানার্জি—খালি নিজের ব্যালান্সে ঠিক রেখে ছাতা জুতো কন্ট্রোল করে যাবি এবং যথা ইচ্ছা তথা যাবি।
হায় রাম, ওহ্ কৌন বা?
অ্যাই রোখকে— ইয়াঃ!
উফ্স, অনেক চেষ্টা করেও বেচারা সেপাইটাকে পাশ কাটাতে পারলুম না!

ঠারো, হাম তুমকো দেখ লেঙ্গে! ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন আউর রাস ড্রাইভিং কে লিয়ে তুমকো পানিশমেন্ট ভি হোগা।
ওরে বাবা! সেপাইটাকে খেপিয়ে দিয়েছি, পা থেকে এ জুতো না ছাড়াতে পারলে কপালে না জানি আরও কি আছে।
আঃ, ঐ তো আমার আমার জুতো যান আসছে!
দাঁড়া চুনো তোকে আমি ধরছি
সেফ ল্যান্ডিং!
উফস্! বজ্জাত হারামজাদা! ছুঁচো—
FEB: 87
এবার তোর কেমন অভিজ্ঞতা হল বল
ফ্যান্টাস্টিক! এ জিনিস স্বয়ং ঈশ্বরের মাথাতেও আসবে না, তৈরী তো দূরের কথা!
যাঃ, কি যে বলিস! বলিস!
এবার তুই একবার পরীক্ষা করে দ্যাখ।
অবশ্যই। আমি রেডি— ছাতাটা দে।
না না, তোকে ছাতা নয়—দুসরা ব্যবস্থা হবে। তুই ঘুরে দাঁড়া!

ঘুরে দাঁড়াবো? তুই কি এতে আর নতুন কিছু অ্যাড্ করতে চাস?
নিশ্চয়! সেটা এখুনি দেখতে পাবি।
হতভাগা বৈজ্ঞানিকের নিকুচি করেছে! দ্যাখ এবার–
আউস্!
ক্যাঁতাস্
আই-ই-ই-ই-!
তকাং
ওফস্!
আরে! ওহি তো সেই বদমাস্ কাঁহিকা!
এ্যাইও, রামরাজত্ব পায়া হ্যায়? পহলেবার ছুট্ গিয়া আভি তো ছড়ুঙ্গা নেহি। চলে থানে মে।
অ্যাঁক্! ও-ওটা আমি নয় সেপাইজী – ও দুসরা আদমী ছিল!
ফির্ এই ঝুটা বাতকে লিয়ে পানিশমেন্টা জাদা হো জায়গা।
আমার মনে হয় প্রথমে পুলিশকে ঘুঁস্ দিয়ে তোর আবিস্কারটাকে গছাতে হবে। নইলে এটা রাস্তায় বের করাই মুসকিল্ পারিস তো এই সুযোগে ওদের সঙ্গে কথাটা বলে দেখিস।
ইডিয়েট!

বেতার আবিষ্কার

সমীর কুমার সূত্রধর

বেতার হল আধুনিক বিজ্ঞানের এক বড় বিস্ময়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের মধ্যে বেতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে কোন তার বা সংযোগ ছাড়াই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের কথা বা ঘটনা আমরা ঘরে বসে শুনতে বা জানতে পারি। বেতার আধুনিক জীবনধারা দ্রুত ও আরামদায়ক করেছে। এর সাহায্যে ঘরে বসে দেশ-বিদেশের খবর পাই, গান শুনি, দূরে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করি।

আমরা 'পুরাণ' [Mythology]-এ পাই, প্রাচীন কালে আমাদের ভারতবর্ষে ঋষি-মুনিরা তপোবনে বসে শত শত মাইল দূরের ঘটনা স্বচক্ষে দেখতেন, সে জায়গার কথা তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শুনিতে পেতেন এবং প্রয়োজন মত তাঁদের বাণীও পাঠাতেন। 'পুরাণ' এ পাওয়া যায় অপূর্ব যোগশক্তির বলে তাঁরা এই অসাধ্য সাধন করতে পারতেন। দূর বলে কিছু ছিল না।

পুরাণ-এর যুগের পর এলো ইতিহাসের যুগ, লিখিত প্রমাণের যুগ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের যুগ।

মাত্র একজন বিজ্ঞানীর জীবনব্যাপী গবেষণা ও সাধনার ফলে এই বেতার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। একজন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় বেতার রহস্য মানবসমাজে আত্মপ্রকাশ করেনি। অনেক বিজ্ঞানীর অনেক দিনের অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে মানুষ এই বেতারের বিস্ময়কর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন।

আমরা ভুলে গেলে ভুল হবে, বেতারবার্তার জনক হিসাবে ইটালির পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্চিস্ গুগ্লিমো মার্কনি [Maschese Guglelmo Marconi : 1874—1937] যদিও বিশ্বে পরিচিত ও সমাদৃত কিন্তু তিনিই এই বিষয়ে প্রথম বিজ্ঞানী বা মানুষ নন।

ইংল্যাণ্ডের মাইকেল ফ্যারাডে [Michael Faraday : 1791—1867] স্যর অলিভার যোসেফ লজ [Oliver Joseph Lodge : 1851—1940], স্কটল্যাণ্ডের অধ্যাপক জেমস ক্লার্ক ম্যাকস্ওয়েল [James Clark Maxwell : 1831—1879], জার্মানীর অধ্যাপক হেইনরিখ রুডলফ হার্টজ [Heinrich Rudolf Hertz : 1857—1894], ফ্রান্সের অধ্যাপক এডওয়ার্ড ব্রাঁলি [Edourd Branly : 1844—1940], ভারতের স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু [1858—1937] প্রমুখ বিজ্ঞানীর মৌলিক অবদানের ফলে বেতারযন্ত্র উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। এঁদের একজন অন্যজনের পরিপূরক। এঁদের আবিষ্কারকে সম্বল করেই অধ্যাপক মার্কনি বেতারযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। বাস্তব পক্ষে তিনি কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেননি। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের আবিষ্কৃত তথ্য মানুষের কাজে লাগিয়েছেন। অবশ্য অধ্যাপক মার্কনির অবদানকে কোনভাবেই ছোট করা যায় না।

এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত, অধ্যাপক মার্কনির নাম বেতারের আবিষ্কারক হিসাবে ঘোষিত হলেও আমাদের ভারতের এক ঋষিতুল্য সুসন্তান স্যর জগদীশচন্দ্র বসুই বেতারবার্তার সূত্র প্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি তাহা 'কৃতিস্বত্ব' [Patent] করতে রাজি হননি। তাই তাঁকে বেতারের জনক বলা হয় না।

অধ্যাপক মার্কনি যে বেতারের প্রকৃত আবিষ্কারক নহেন, প্রকৃত আবিষ্কারক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, তাহা এদেশে

প্রথম বলেন খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্র [জন্ম 1891—]।

উল্লেখনীয়, ডঃ ম্যাহলন লমিস [Mahlon Loomis: 1826—1886] বেতারবার্তা প্রেরণ পদ্ধতি (radio transmission system) র প্রাচীনতম বর্ণনা দেন 1864 সালের 21 জুলাই-এ এবং বেয়ার্‌সডেন [Bear's Den, Loudoun County, Va] নামক জায়গায় 1866 সালের অক্‌টোবর মা স দুইটি ঘড়ির সাহায্যে প্রমাণ করেন। তিনি 1862 সালে 20 জুলাই তারিখে 'ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট অব টেলিগ্র্যাফিং' [Improvement of Telegraphing] আমেরিকায় 'কৃতিস্বত্ব' করেন [Patent No. 129971]।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করেন. কোন জিনিসে বিদ্যুৎ সঞ্চার হলে তার নিকটবর্তী আকাশে একটি টান (Strain) পড়ে। তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর অধ্যাপক ম্যাকস্‌ওয়েল এই পরিকল্‌পনা গণিতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাছাড়া তিনি 1864 সালে একটি নতুন কথাও বলেন—একটি জিনিসে হঠাৎ বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হলে ফ্যারাডের পরিকল্পনা অনুযায়ী আকাশে টান পড়ার উপরেও তার সংগে সেই টান ঢেউ-এর আকারে বিদ্যুৎ আশ্রিত বস্তুটির থেকে চুতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর গতি ঠিক আলোর গতির মত প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,282 মাইল অর্থাৎ 2,99,728 কিলোমিটার। অধ্যাপক ম্যাকস্‌ওয়েল 1865 সালে আবিষ্কার করেন 'ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক' [Electro-magnetic]। ইংরাজ বিজ্ঞানী স্যর যোসেফ জন থমসন [Joseph John Thomson : 1856—1940] এই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন অধ্যাপক হার্টজ। দশ বছরের অক্লান্ত সাধনায় তিনি প্রমাণ করেন যে বিদ্যুৎতরঙ্গ ও আলোকতরঙ্গ এক জাতীয় পদার্থ। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে এই দুটি প্রকৃতপক্ষে এক—ইথারে খুব ছোট ছোট ঢেউ হলে আলো ও বড় বড় হলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বলা হয়। অধ্যাপক হার্টজ আবিষ্কৃত তরঙ্গ তোলা যন্ত্রটির নাম 'স্কিলেটর' [Scillator]।

অধ্যাপক হার্টজ-এর ইথার তরঙ্গ সম্বন্ধে তখন ইটালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদ্বয় অগাস্ট রিঘি (Angusto Righi : 1850—1920) এবং ওরেস্টা গবেষণা করেন।

অপরদিকে স্যর যোসেফ লজ, অধ্যাপক বাঁলি এবং স্যর জগদীশচন্দ্র বসু বেতারযন্ত্র উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা করেন। অধ্যাপক বাঁলির যন্ত্রটির নাম 'কোহেরার' (Coherer)।

ইংরাজ বিজ্ঞানী স্যর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড [Ernest Rutherford, পরে Lord Rutherford : 1871—1937] এবং রুশ বিজ্ঞানী আলেকজেণ্ডার স্টেপানোভিচ্‌ পপফ [Alexander Stepanovi ch Popoff : 1859—1906] ও এমন যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। প'পফ ঢেউ কিভাবে দূরে পাঠানো যায় তাহা একটি মাস্তুলের সাহায্যে তার লাগিয়ে আকাশ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করেন। একে 'এরিয়্যাল্‌' [aerial] বলা হয়।

নাথান বি স্টুবলফিল্ড [Nathan B. Stubblefield : মৃত্যু 28 মার্চ 1928] নামক এক ব্যক্তি মুরে (Murry Ky) টাউন স্কোয়ারে 1892 সালে এক জনসভায় বেতার প্রেরণ (Wireless transmission) এর উপর বক্তৃতা প্রদান করেন।

এবার আমরা স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর কথায় আস্‌ছি। তিনি বিদ্যুৎ তরঙ্গের গুণ পরীক্ষা করার জন্য 1895 সালে একটি সুন্দর বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেন। সে সময় বিজ্ঞানী সমাজ তাঁর বেতারযন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি একদিন তাঁর সম্মুখের টেবিলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন এবং নিকটবর্তী ঘরে ছিল বারুদ ভর্তি পিস্তল। তাঁর টেবিল থেকে সেই পিস্তলের দূরত্ব ছিল 75 ফুট। স্যর বসু তাঁর যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিনাতারে বিদ্যুৎ প্রেরণ করে পিস্তলের ঘোঁড়ায় (Trigger) আঘাত করেন, এবং সংগে সংগে সেই পিস্তলের শব্দ হল—'গুড়ুম্‌'।

স্যর বসু বেতারে শব্দ প্রেরণের যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তার সাহায্যে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এক মাইল দূরবর্তী তাঁর বাসভবনে সাংকেতিক শব্দ প্রেরণ করতে সমর্থ হন।

এবার অধ্যাপক মার্কনির কথায় আসা যাক। বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে এসে তিনি অদৃশ্য বিদ্যুৎ

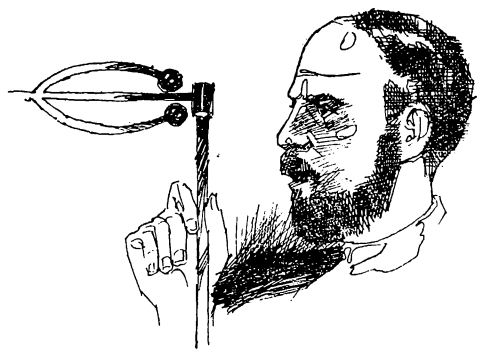

তরঙ্গের সংগে প্রথম পরিচিত হন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকদ্বয় রিঘি এবং ওরেস্টার কাছ থেকে যেদিন তিনি (অধ্যাপক মার্কনি) এই নবজাত

বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেন, সেদিন থেকেই তাঁর মনে বেতারবার্তার স্বপ্ন জাগে।

অবশেষে 1895 সালের কোন এক শুভ মুহূর্তে তিনি সাফল্য লাভ করেন। তাঁর বেতারযন্ত্রের একটি 'সুইচ' (Switch) টিপতে পাশের ঘরে ছোট শব্দ হয়। এই ছিল অধ্যাপক মার্কনির বেতারযন্ত্রে প্রথমত পদক্ষেপ।

অধ্যাপক মার্কনির বেতার যন্ত্রে প্রথমমত প্রেরক যন্ত্র (transmitter) ও গ্রাহকযন্ত্র (Receiver) দুইটির পার্থক্য ছিল কয়েক ফুট মাত্র, কিন্তু একবছর পর এক মাইল দূরে বার্তা প্রেরণে সক্ষম হন। উল্লেখনীয়, অধ্যাপক হার্টজের বিদ্যুৎ তরঙ্গ তোলা যন্ত্র 'Scillator' প'পফের দূরে পাঠানোর উপায় 'aerial' এবং বাঁলির গ্রাহকযন্ত্র 'Coherer' এই তিনটির সমন্বয়ে অধ্যাপক মার্কনি বেতারে বার্তা আদান-প্রদান করেন।

কিন্তু তাঁর যন্ত্র ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

অধ্যাপক মার্কনির বেতার যন্ত্রের এক জায়গায় একটি প্রেরক যন্ত্র থাকে। প্রেরক যন্ত্র আকাশে বিদ্যুৎ তরঙ্গ তোলে। এই তরঙ্গ প্রসারিত করার জন্য উঁচু মাস্তুলে তার টানিয়ে সেখানে প্রেরকযন্ত্রের বিদ্যুৎ প্রবাহ চালানো হয়। তার নাম প্রেরক বিমান (Tran mitting aerial)।

আগেই বলা হয়েছে, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু 1893 সালে বেতারে বার্তা প্রেরণে সাফল্য লাভ করেন। তিনি 1896 সালের 1 জুন তারিখে লণ্ডনে এক সভায় তাঁর বেতার-যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রদর্শন করেন। সৌভাগ্যবশতঃ ঐ সভায় অধ্যাপক মার্কনিও উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের যন্ত্রের ভুল ত্রুটি ধরতে পারেন। সমস্ত রাত জেগে নিজ যন্ত্রের ভুল-ত্রুটি দূর করে পরদিন (2 জুন) স্বনামে বেতার যন্ত্র 'কৃতিস্বত্ব' করেন (Patent No. 12039) এবং জগতে বেতারের আবিষ্কর্তারূপে পরিগণিত হলেন।

1909 সালে অধ্যাপক মার্কনি এবং জার্মান বিজ্ঞানী অধ্যাপক কার্ল ফার্ডিনাণ্ড ব্রন [Karl Ferdinand Braun : 1850—1918] কে যৌথভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বেতার সভ্যতার গতিপথকে সবচেয়ে বেশি চলৎশক্তি দিয়েছে। বেতারের দ্বারা আজ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

শান্তিধাম কালীবাড়ি হাইস্কুল নিউ কলোনী,
বনগাইগাঁও-78338 আসাম।

গণিতজ্ঞ রামানুজন

সৌমেন দাস

রামানুজন তামিলনাড়ু প্রদেশের কোয়েম্বাটোর জেলার কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত ইরোড শহরে তাঁহার মাতুলালয়ে 1887 খ্রীঃ 22 ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। রামানুজের প্রাথমিক পরিবেশ তার প্রতিভা প্রস্ফুটিত হওয়ার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। রামানুজন ছাত্র হিসেবে আদৌ ভালো ছিলেন না। অঙ্ক ভিন্ন অন্য বিষয়ে খুব কম নম্বর পেতেন। রঙ্গনাথন বলেন, (রামানুজন-এর শিক্ষক) "I found Ramanujan's F. A. marks in one of those volumes. He had really scored very high percentage marks in mathematics. His failures was due to poor marks in the other Subjects.

একবার ভি. রামস্বামী আয়ার, ভারতীয় গাণিতিক সঙ্ঘ পত্রিকায় গণিত সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্তোলন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য ছিল যে, যে কোন গণিতজ্ঞ ইচ্ছা করলে উহা সমাধান করে প্রকাশ করতে পারতেন। ইহার অন্য উপকারিতা ছিল যে, তরুণ গণিতজ্ঞ বা গণিতে উৎসাহী এরূপ ব্যক্তিগণ কোন কোন প্রশ্ন নিয়ে তার সমাধানে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারতেন। স্মরণীয় যে দুরূহ প্রশ্নের সমাধান যেমন কঠিন, উহা উদ্ভাবন করাও খুব সহজ বিষয় নয়।

রামানুজন ভারতীয় গাণিতিক সঙ্ঘ পত্রিকায় 59টা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তন্মধ্যে 39টা প্রশ্নের সমাধান পাওয়া গেছে। বাকি 20টা প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। রঙ্গনাথন তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে রামানুজনের 11টা প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। প্রশ্নের রূপ দেখানর উদ্দেশ্যে নমুনাস্বরূপ রামানুজন প্রদত্ত দুটি প্রশ্ন নিম্নে উদ্ধৃত হল :

প্রশ্ন নং 284

সমাধান কর, $\frac{x^5-6}{x^2-y}=\frac{y^5-9}{y^2-x}=5(xy-1)$

প্রশ্ন নং 1070

দেখাও যে, $\left(\frac{3+2\sqrt[4]{5}}{3-2\sqrt[4]{5}}\right)^{\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt[4]{5}+1}{\sqrt[4]{5}-1}$

C/o. সুনীলকুমার দাস, বাচমারীগতঃ কলোনী,
পোঃ বাচমারী, জেলা মালদহ 732192।

তুলসী মহিমা

ছন্দোময় মন্ডল

তুলসী হিন্দুদের কাছে এক অতি পবিত্র গাছ। সকল বাড়িতেই প্রায় এক বা একাধিক তুলসী গাছ থাকে। অনেকের ধারণা সংস্কারবশতঃই শুধু তুলসী গাছ লাগান হয়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

তুলসী বীরুৎ-শ্রেণীর দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Ocimum sanctum. বাড়ির লাগোয়া জমিতে ও রাস্তার ধারের পতিত জমিতে তুলসী গাছ স্বচ্ছন্দে বেড়ে ওঠে। এদের কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা অনেকটা চৌকোণা। তুলসীর শাখা-প্রশাখার ডগায় উৎপন্ন লম্বা অক্ষের গায়ে অনেকগুলি ছোট ছোট সাদাটে অথবা হাল্কা বেগুনী রঙের ফুল সাজান থাকে।

তুলসীর ভেষজ গুণের তুলনা নেই। তুলসী পাতার রস সর্দি-কাশি ও ব্রঙ্কাইটিস রোগে ফলপ্রদ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ঐ রস পেটের গোলযোগে, বমন ইচ্ছা দমনে, শ্বাসনালীর জ্বালার উপশমে ব্যবহৃত হয়। কানের ব্যথা ও চর্মরোগে এই পাতার রস ফলপ্রসূ। মূত্রাশয়ের রোগে তুলসী বীজের রস উপকার দেয়। হাম বা বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক হিসাবেও তুলসী পাতার রস ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু এসবই গেল তুলসীর সাধারণ ভেষজগুণের কথা। এগুলির কথা সকলেই কম-বেশি জানে। এবারে তুলসীর এক অত্যাশ্চর্য মহিমার কথা জানাই।

গবেষণা করে জানা গেছে যে মশা তাড়াতে তুলসী গাছ খুব উপকারী। আশ্চর্য লাগলেও একথা সত্যি। পশ্চিম বাংলার 'দার্জিলিং টু দীঘা' সর্বত্রই মশার রাজত্ব। বর্ষায় এদের সংখ্যা বেড়ে যায় প্রচুর পরিমাণে। ফলে মশাজনিত সংক্রামক রোগ, ম্যালেরিয়া ও এনকেফেলাইটিস্ রোগে প্রায় বছরই বেশ কিছু লোকের মৃত্যু হয়। তাই মশা থেকে দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু কচ্ছপ ধূপ কেনার বা মশারির তলায় শোয়ার সক্ষমতা রয়েছে সীমিত সংখ্যক মানুষের।

মশার হাত থেকে বাঁচার এক সহজ উপায় আছে এবং এতে বেশি পরিশ্রমেরও দরকার নেই। বাড়ির চারপাশে তুলসী গাছ লাগালে দেখা যাবে মশার সংখ্যা বেশ কমে গেছে। আরো ভাল ফল পাওয়া যাবে ছোটো ছোটো টবে তুলসী গাছ লাগিয়ে ঘরে কাজ করার টেবিলের পাশে রেখে দিলে। মানি প্ল্যান্টের বদলে নতুন এই তুলসী প্ল্যান্টও দেখতে খারাপ লাগবে না, যদি তুলসী গাছগুলো পরিমাণ মত ইউরিয়া ও জল পেয়ে ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। এত হাঙ্গামা না করে নিজেকে বাঁচাতে চাইলে তারও উপায় আছে। তুলসী পাতা ছিঁড়ে গায়ে মাখলে মশাও আসতে পারে না, আর কোন চর্মরোগ থাকলে তাও সেরে যায়। এই রস আবার অ্যান্টিসেপ্টিকও বটে। আর বর্ষায় যেখানে জল জমে সেখানে কেরোসিন তেলের বদলে তুলসী পাতা ছড়িয়ে দিলেও মশার ডিম পাড়া বন্ধ হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মশাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে তুলসী গাছ ও তুলসী পাতা খুব উপকারী। বনসৃজন কর্মসূচীর সাথে প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা করে তুলসী গাছ লাগালে পশ্চিমবঙ্গে মশা ও মশাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দারুণভাবে কমে যাবে।

বি-15/77, লেকপ্লেস, কল্যাণী, নদীয়া, 741235।

ছড়া

আবিষ্কার

আশা দেবী

পিথাগরাসের আবিষ্কার
অমূল সংখ্যা
অঙ্কের জগতে
বাজালেন ডঙ্কা।

হিমানী-সম্প্রপাত

হুগো জার্নস ব্যাক

ভাবানুবাদঃ শ্রীচির সেনাপতি

ল্যাবরেটরীর মধ্যে কম্পন থেমে যেতে কাঁচের চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন দীর্ঘদেহী মানুষটি। টেবিলের ওপরের জটিল যন্ত্রপাতির দিকে তার নজর। যন্ত্রটির মধ্যে কোথাও কোন খুঁত নেই। তারপর ক্যালে-ণ্ডারের দিকে তাকান তিনি। আজকের তারিখঃ 2660 সালের পয়লা সেপ্টেম্বর। আগামীকালটা হবে তার পক্ষে একটা মস্তবড় ব্যস্ততার দিন। কারণ তিন বৎসরব্যাপী একটা এক্সপেরিমেণ্টের শেষ পর্যায় দেখার দিন ওটি। নিজের শরীরে টান-টান ভাব রেখে হাই তোলেন তিনি। তাতে তার সময়ের মানুষের চেয়ে দৈহিক গঠনের গড়পড়তা মান একটু বেশিই দেখায়। তাহলেও তার বিশাল মনের সঙ্গে সেটার কোন তুলনা হয় না। মানুষটির নাম র‍্যাল্‌ফ 124.41+1, জীবিত মহত্তম বিজ্ঞানীদের একজন তিনি। সারা পৃথিবী গ্রহে মাত্র যে দশজনকে তাদের নামের শেষে 'প্লাস'-চিহ্ন ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া আছে, র‍্যাল্‌ফ তাদেরই একজন।

দেওয়ালের পাশে টেলিফোটের দিকে এগিয়ে এক ঝাঁক বোতাম টেপেন তিনি। কয়েক মিনিট বাদে উজ্জ্বল হয় টেলিফোটের ধাতব-পর্দা। দাড়ি-গোঁফ কামানো প্রায় তিরিশ বৎসর বয়সী একজন মানুষের মুখের ছবি ফুটে ওঠে স্পষ্ট-ভাবে সেটার ওপর। হাসিখুশি মাখা মুখ। তবে চপলতার চিহ্নমাত্র নেই। টেলিফোটের পর্দায় নিজের মুখখানাকে দেখে চিনে নিয়েই সহাস্যে বলেন তিনি, 'হ্যালো, র‍্যাল্‌ফ !' বন্ধু এড্‌ওয়ার্ডকে ডেকে বলেন, 'আগামীকাল সকালে ল্যাবরেটরীতে যদি তুমি আসতে পারো, কোন একটা অসাধারণ চমৎকার জিনিস আমি তোমাকে দেখাতে পারি।

ওই যে, দেখো'—বলে তিনি সরে দাঁড়ান যন্ত্রটির একপাশে, যাতে তার বন্ধু টেবিলের ওপরের যন্ত্রটিকে এক নজর দেখে নিতে সক্ষম হন। টেলিফোটের পর্দার কাছ থেকে প্রায় দশ ফিট্ দূরে রয়েছে যন্ত্রটি। ওদিকে এড্ওয়ার্ড নিজের টেলিফোটের পর্দার কাছে সরে আসেন এমনভাবে যাতে র‍্যাল্ফয়ের ল্যাবরেটরীর কিছু অংশও নজরে পড়ে তার।

'তুমি যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ করেছো' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন এড্ওয়ার্ড, 'তোমার বিখ্যাত—' বাক্য তার সম্পূর্ণ হয় না, কণ্ঠস্বর থেমে যায়। এদিকে র‍্যাল্ফয়ের টেলিফোটের ধাতব-পর্দাও পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে অকস্মাৎ। র‍্যাল্ফ সেটা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালান কিছুক্ষণ ধরে। নাঃ! হবে না। যখন হাল্ ছেড়ে দিতে উদ্যত তিনি, এমনি সময়ে তার টেলিফোটের পর্দা একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ফের। তবে পর্দার বুকে তো এবার বন্ধুর মুখ নয়। এ যে হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর এক কিশোরীর মুখ। পরনে তার সান্ধ্যপোশাক। পিছনের টেবিলে রয়েছে একটা আলো।

সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ দেখে প্রথমে কিশোরীটিও কম বিস্মিত নয়। মুখ দিয়ে তার অজ্ঞাতে বেরিয়ে আসে, 'ওহ্!'

শুনেই চটপট জবাব দেন র‍্যাল্ফ, 'কেন্দ্রীয় অফিসের গলদ! সার্ভিস সম্পর্কে নিশ্চয়ই একটা অভিযোগ জানাব আমি।'

তারপর মেয়েটি যা বলে, বুঝতে পারেন না র‍্যাল্ফ। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাঙ্গুয়েজ রেকটিফায়ারের চকচকে চাকতিটিকে ঘুরিয়ে দেন। যন্ত্রটি জানিয়ে দেয়, মেয়েটি কথা বলছে ফরাসী ভাষায়, পরিষ্কার ইংরিজিতে তার কথার অর্থ, 'সার্ভিসের ভুল বড় বিরক্তিকর!'

টেলিফোটের পর্দার আরো কাছে সরে আসে মেয়েটি। এখন তার দু'চোখে দারুণ কৌতূহল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে ল্যাবরেটরীর ভেতরটা।

'কী অদ্ভুত লাগছে জায়গাটাকে দেখতে! কী এটা? আপনি কোথায় রয়েছেন?' সারল্যভরা কণ্ঠে শুধোয় কিশোরী।

'নিউইয়র্ক।' র‍্যাল্ফ জবাব দেন আলস্যভরে।

'এখান থেকে অনেক দূর।' উজ্জ্বল মুখে বলে সে, 'আমি কোথায় আছি শুনলে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন।'

'আমি মোটামুটি একটা অনুমান করে নিতে পারি।' র‍্যাল্ফয়ের জবাব, 'গোড়া থেকেই ধরা যাক। ফরাসী ভাষায় তুমি কথা বলো। দ্বিতীয়তঃ নিউইয়র্কে এখন বিকেল, ঘড়িতে মাত্র চারটে বাজে। অথচ তোমার পিছনে টেবিলে একটা আলো জ্বলতে দেখা যায়। সান্ধ্য পোশাক তোমার পরনে। এখন নিশ্চয়ই তোমাদের ওখানে সন্ধে হয়ে গিয়েছে। তারও পর তোমার ঘরে তাকের ওপরে রাখা ঘড়িটিও সময় নির্দেশ করছে—ন'টা! আমি বলতে পারি, তুমি ফ্রান্সে রয়েছো। নিউইয়র্ক আর ফ্রান্সের সময়ের মধ্যে তফাত পাঁচ ঘণ্টা!'

'বাঃ! দারুণ বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছেন। তবে আপনার কথাগুলো কিন্তু সঠিক নয়। আমি ফ্রান্সের অধিবাসী নই। আমার বাড়ি পশ্চিম সুইজারল্যাণ্ডে। সুইজারল্যাণ্ডের সময়ও আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ফ্রান্সের সময়ের মতো।'

হেসে ওঠেন র‍্যাল্ফ। মেয়েটিও হেসে ওঠে। তারপর বলে, 'আপনার মুখখানা আমার কাছে খুব পরিচিত ঠেকছে। মনে হয় আগে আমি আপনাকে দেখেছি।'

'অসম্ভব নয়।' তিনি স্বীকার করেন। কিছু পরিমাণে যেন বিব্রত। বলেন, 'তুমি হয়তো আমার কোন ছবি দেখেছো।'

'ওহ্! আমি কী বোকা!' বিস্ময়ের সঙ্গে চীৎকার করে বলে মেয়েটি, 'দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে চিনতে পারলাম না কেন? আপনি আমেরিকার মহৎ উদ্ভাবক র‍্যাল্ফ 124c 41+, যিনি সমাজ থেকে নিজেকে সব সময়ে সরিয়ে রাখতে চান।'

একটু ইতস্তত ভাব মেয়েটির মধ্যে। তারপর ও বলে আবেগপ্রবণ গলায়, 'আপনার অটোগ্রাফ চাওয়াটা কি আমার পক্ষে অন্যায় হবে?'

মেয়েটির অনুরোধ তাকে যে একটু খুশি করে তুলেছে, সেটা উপলব্ধি করে নিজে যেন অবাকও হন র‍্যাল্ফ! সাধারণতঃ স্বাক্ষর শিকারীদের তিনি প্রত্যাখ্যান করে দেন এক কথায়। এবার তা পারেন না। বলেন, 'নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু কার খাতার পাতা নিজের স্বাক্ষরটা দিচ্ছি, সেটা আগে থেকে জানতে পারলে ভাল হয় না কি?'

'আমি সুইজারল্যাণ্ডের ভেনট্যাল্প-য়ের এ্যালিস 212B 423।'

র‍্যাল্ফ অতঃপর টেলঅটোগ্রাফ যুক্ত করেন তার টেলিফোট্-য়ের সঙ্গে। ওদিকে মেয়েটিও তাই করে। উভয় যন্ত্রপাতির সংযোগ সাধন হয়ে যাওয়ার পর তার নাম সই করেন র‍্যাল্ফ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পান তার দেওয়া সইটা ফুটে উঠেছে সুইজারল্যাণ্ডের মেশিনে।

'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব' আনন্দোচ্ছল মেয়েটি বলে, 'আপনার অটোগ্রাফ পেয়ে গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে। যোগ-চিহ্ন-দেওয়া (+) আসল স্বাক্ষর আমি আগে কখনও দেখিনি। এই উপগ্রহে তেমন মানুষ তো রয়েছেন মাত্র দশজন। তাদের মধ্যে একজনের সই সংগ্রহ করতে পারাটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যাই হোক, এভাবে আপনার সময় নষ্ট করে দেওয়া আমার পক্ষে অনুচিত। কিন্তু কী করি বলুন, পাঁচ পাঁচটা দিন আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। দুটো কথা বলার জন্যে যেন মরে যাচ্ছিলাম!'

'তোমার কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে। বলতো

অতদিন তুমি কথা বলতে পারোনি কারো সঙ্গে, কেন? তোমার এমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ার কারণটা কী!'

জবাব দেয় কিশোরীটি; 'শুনুন তাহলে। উঁচু পাহাড় মাউণ্ট রোসা। তারই ওপর মাঝামাঝি এক জায়গায় আমাদের এই বাড়ি। বাড়িতে মাত্র তিনজন মানুষ। বাবা, দাদা আর আমি। গত পাঁচদিন ধরে একটা ভয়ঙ্কর প্রবল হিমঝড় বয়ে গেছে এখানে। আমাদের সারা বাড়ি ঢাকা পড়ে গেছে বরফে। ঝড় এমন ঘটনা ছিল যে কোন রকম বায়ুযানই আসতে পারেনি আমাদের বাড়ির কাছ বরাবর। আমি জীবনে দেখিনি এমন সাংঘাতিক। পাঁচদিন আগে আমার বাবা আর দাদা প্যারিস যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। ওদিন বিকেলে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় আমার দাদার হাঁটুর হাড় সরে যায়। কাজেই দুজনেই তারা প্যারিসের কাছে কোথাও আটকে পড়ে। ইতিমধ্যে আমাদের এখানে শুরু হয়ে যায় তুষার-ঝড়! ফলে উপত্যকার কোন এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে টেলিসার্ভিস লাইন। পাঁচদিন বাদে এই প্রথম আমার লাইনে নিউইয়র্কের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে। যদিও কীভাবে তা হলো, সেটা আমার কাছে এখন একটা ধাঁধার মতোই।'

'হ্যাঁ, এমনটা সাধারণভাবে ঘটে না। কিন্তু রেডিওর ব্যাপারটা কী?'

'কোন রকম যোগাযোগ ব্যবস্থাই অক্ষত নেই এখানে। টেলিগ্রাফের, বৈদ্যুতিক তারের সব খুঁটি একই সঙ্গে শুয়ে পড়েছে তুষারঝড়ের দাপটে! এখান থেকে কোথাও কারো কাছে যে কোন ভাবে যে আমার বিপদের খবর পাঠাব, সে উপায় প্রায় ছিল না। যাই হোক, অনেক কষ্টে বৈদ্যুতিক তারের কয়েকটি হাল্কা খুঁটিকে ফের খাড়া করে দিতে পেরেছি আমি। তাতেই হয়তো টেলিসার্ভিস কোম্পানীর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগ একটা ঘটে গেছে। তাদের আমি বলেছিলাম সব কথা। বিদ্যুৎ সরবরাহটা ফের যাতে এদিকে সঠিক থাকে, সে চেষ্টা করতে অনুরোধ করেছিলাম।'

র‍্যাল্‌ফ বলেন, 'তোমার ঘরে সেকেলে একটা আলো জ্বলতে দেখেও আমার প্রথমে একটু সন্দেহ হয়েছিল, বিদ্যুৎ সরবরাহে কী গণ্ডগোল, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। যাই হোক, তোমার বুদ্ধি, চেষ্টা আর সাহসের সত্যি প্রশংসা করি আমি। ওরা হয়তো এসময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাটা ঠিক করে দিয়েছে। অতএব ল্যুমিনর্‌ কাজ করবে, আশা করি।'

'আপনি ঠিক বলেছেন।' চেঁচিয়ে বলে ওঠে মেয়েটি। 'আহ্‌! লাক্স!'

ল্যুমিনর্‌-এর ডিটক্‌টোফোনের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সাড়া দেয় মেয়েটির কথায়। সাদা সীলিংয়ের নিচে ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে-থাকা সরু সরু তার থেকে বেরুতে থাকে নরম-নরম ফ্যাকাসে লাল লুমিনর রশ্মি। তারপরই অতি উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে যায় ঘরের মধ্যে।

এবার তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে মেয়েটি, 'লাক্স-ডাহ্‌।'

যন্ত্র সাড়া দেয় ফের। কমে আসে আলোর তীব্রতা ঘর ফ্যাকাসে লাল আলোর সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মেয়েটির মুখে হাসি, 'এবার অনেক ভাল। হীটারও গরম হতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডায় জমে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম আমি। একবার চিন্তা করে দেখুন! পাঁচ-পাঁচটা দিন এতটুকুও উষ্ণতা ছিল না! আমার ধারণা, আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের ঘরের উষ্ণতা বজায় রাখত শুকনো কাঠ ইত্যাদি জেবলে। আমি সত্যি তাদের ঈর্ষা করছিলাম মাঝে মধ্যে।'

র‍্যাল্‌ফ বলেন, 'সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থা। এখনকার আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুউবই খারাপ। এ অভিজ্ঞতা যেমন নতুন, তেমনি অদ্ভুত, তাই না? গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি তুষার-ঝড়ের কারণটাই তো আমার বোধগম্য নয়।'

মেয়েটি বলে, 'কয়েক মাস আগে আমাদের জেলায় চারজন আবহ-ইঞ্জিনীয়ার নিজেদের ন্যায্য দাবি দাওয়া আদায় করা নিয়ে গণ্ডগোল বাধায় গভর্নরের সঙ্গে। তাদের দাবি মানতে অস্বীকার করেন গভর্নর। তখন তারা চারটে মিটিওরো-টাওয়ার খুলে দিয়ে পালিয়ে যায়। টাওয়ার-গুলোতে শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড পরিমাণে উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহ। ঘটনাটা সন্ধের সময়ের। বাবার কাছে আমার এসব কথা শোনা। আমাদের উপত্যকার চারদিকে অবস্থান করছে ওই টাওয়ার চারটি। মাঝরাতে আমাদের সারা জেলা ঢেকে গিয়েছিল দু'ইঞ্চি বরফে। তারা করেছিল কী, বিদ্যুৎ প্রবাহ যাতে নিচের দিকে যায় সেই উদ্দেশ্যে সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল বিশেষভাবে কিছু যান্ত্রিক সরঞ্জাম। ষড়যন্ত্রের জালটা তারা ভালই পেতেছিল। কারণ টানা চারদিন ওই টাওয়ারগুলোর দিকে এগোনো সম্ভব হয়নি কারো পক্ষে। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য আরো চল্লিশটা মিটিওরো-টাওয়ার থেকেও সোজাসুজি বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপরই ফিউজ হয়ে গলে যায় স্থানীয় টাওয়ার চারটি।

'আমার বাবার বিশ্বাস, বাকি টাওয়ারগুলো হয়তো আমাদের জেলার ওপর শীগ্‌গির একটা প্রত্যক্ষ নিম্নচাপ দেওয়া শুরু করবে। তবে ওগুলো তো আমাদের কাছাকাছি নেই। তাই তুষার আর বরফ গলাবার মতো উত্তাপ সৃষ্টি করতে তারা হয়তো চব্বিশ ঘণ্টা সময় নেবে।'

আরো কিছু বলতে চায় মেয়েটি। হাঁ করে ছিল। এমন সময়ে ভয়ঙ্করভাবে বেজে ওঠে একটা বিদ্যুৎ ঘণ্টা। আওয়াজটা এমনই তীব্র চার হাজার মাইল দূরে র‍্যাল্‌ফয়ের ল্যাবরেটরীতে এসে পৌঁছোয় তার কম্পন। তখনই

পরিবর্তন হয়ে যায় মেয়েটির মুখের চেহারা। হাসি উধাও। অপরিসীম আতঙ্কের ছায়া কাঁপে তার দু'চোখের তারায়!

এসব লক্ষ্য করে র‍্যাল্‌ফ শুধোন, 'হঠাৎ কী হল তোমার?'

আতঙ্কগ্রস্ত মেয়েটির জবাব, 'একটা তুষার-ধস! ওটা এইমাত্র শুরু হয়েছে! ওহ্। কী যে করি! আমি কী করব? মনে হয়, পনের মিনিটের ভেতর ওটা পৌঁছে যাবে এখানে। আমি যে এখন সম্পূর্ণ অসহায়! বলুন! বলুন। আমি কী করব, বলুন আপনি।' মৃত্যু ভয়ে অস্থির মেয়েটি!

বিজ্ঞানীর মনের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তিনি চেঁচিয়ে বলেন, 'তোমাদের বিদ্যুতের তারের খুঁটিগুলো খাড়া আছে তো? জল্‌দি জবাব-দাও।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি আগেই অনেকগুলো খুঁটি খাড়া করে দিয়েছিলাম। কিন্তু কী হবে তাতে?'

'তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমাদের ওয়েভ্‌লেংথ কত জানা আছে?'

'হ্যাঁ, জানি। 629।'

'অসিলেইটরীর, মানে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বারংবার বিপরীতমুখী বিদ্যুত-তরঙ্গের খবর?'

'491,211'.....

'তুমি নিজে এটাকে পরিচালনা করতে পারবে কি?'

'হ্যাঁ, করতেই হবে। ঝুঁকি যতই থাকুক!'

র‍্যাল্‌ফ বলেন, 'তোমাদের বাড়িতে বিদ্যুৎসরবরাহকারী মাথার ওপরের তারের সঙ্গে ঝড়ে-পড়ে-যাওয়া কোন খুঁটি লাগিয়ে দিতে পারো?'

মেয়েটি বলে 'খুঁটিগুলো ভারী নয়। এ্যালোম্যাসিনিসিয়ামে তৈরি।'

'ঠিক আছে। যা'করার তা' খুউব চট্‌পট করতে হবে। তোমাদের বাড়ির ছাদে উঠে যাও এখনি।'

বাড়ির সঙ্গে বিদ্যুৎযোগাযোগর খুঁটিটাকে মাথার ওপরের মেইন্ তারের সঙ্গে ঠেকিয়ে তুষার-ধসটি ঘুরিয়ে রাখো। তারপর ডাইরিক্‌টোস্কোপকে রাখো ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। আর উত্তর-পূর্বদিক লক্ষ্য করে থাকবে বিদ্যুৎবাহী এ্যান্‌টেনার মুখ। সময় নেই! দৌড়ে যাও। বাকি কাজ আমার।'

মেয়েটির হাত থেকে রিসিভার নেমে যায়, লক্ষ্য করেন র‍্যালফ। টেলিফোটের পর্দা থেকে দ্রুত অপসৃত হয় তার মূর্তি। র‍্যাল্‌ফ তৎক্ষণাৎ কাঁচের সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে যান নিজের বাড়ির ছাদে। অতঃপর তার প্রকাণ্ড এরিয়ালটি নাড়তে থাকেন। ফলে সেটা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে যায়। ক্ষান্ত হন তিনি। এবার মন দেন নিজের ডাইরেক্‌টোস্কোপের দিকে। একটা ছোট্ট ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। তিনি বুঝতে পারেন সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে যান্ত্রিক সম্পর্কে রয়েছে নিখুঁত! ওই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করেন, পয়েণ্টার সঠিকভাবে উত্তর-পূর্ব দিকে ঘুরে গেছে। দারুণ খুশী র‍্যাল্‌ফ। মনে মনে বলেন, 'এবার পাওয়ারটা দেখতে হবে।'

তিনি ছাদ থেকে নেমে গিয়ে ঢোকেন তাঁর ল্যাবরেটরীতে। একটা সুইচ্ টেপেন। পা দিয়ে আর-একটা সুইচ্ টিপেই গ্লাভ্‌সপরা দুই হাত জোর করে চেপে ধরেন নিজের দুই কানের ওপর। সারা বাড়িটা যেন কেঁপে ওঠে ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড এক আওয়াজে! এ আওয়াজ বাড়ির মাথার ওপর সাইরেনের। প্রায় ষাট্ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আওয়াজটা! যারা কোন স্টীল বা ধাতব জিনিসের ধারে কাছে রয়েছে, তা' থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে জরুরী সতর্কবার্তা এটা। সরে না গেলেও নিজেদের তারা অবশ্যই বিদ্যুৎ-অপরিবাহী করে রাখবে।

দশ সেকেণ্ড ধরে দু'বার সাইরেন বাজালেন র‍্যাল্‌ফ। এরও একটা বিশেষ অর্থ আছে। অন্ততঃ বিশ মিনিটের জন্য তিনি ব্যবহার করতে চান একটা চরম শক্তি! ওই সময় পর্যন্ত প্রত্যেকে অবশ্যই সতর্ক থাকবে।

সাইরেনের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোটের পর্দায় ফের ভেসে ওঠে সেই কিশোরী এ্যালিসের মুখ। ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় সে, সবকিছু রেডি! কিন্তু তাকে দেখেই চীৎকার করে ওঠেন র‍্যাল্‌ফ। মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ-অপরিবাহী হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

অতঃপর দেখা যায়, একটা গ্লাস-চেয়ারের ওপর আশ্রয় নিয়েছে আতঙ্কগ্রস্ত এ্যালিস। মুখখানা তার মড়ার মতো সাদা। হাতদুটো দুকানের ওপর চেপে ধরা।

লক্ষণ দেখে র‍্যাল্‌ফ বুঝতে পারেন, হিমানী-সম্প্রপাতের বজ্র নির্ঘোষ থেকে নিজের কানের পর্দা রক্ষা করার চেষ্টা করছে এ্যালিস। তিনি একটা কাঁচের উঁচু সিঁড়িতে উঠে যান। এই প্রথমবার তার চোখ পড়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে। আল্‌ট্রা-জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত প্রকাণ্ড গ্লাস-হুইল্ ধরে ঘোরাতে থাকেন তিনি। এটাই উপযুক্ত সময়।

শুরু হয়ে যায় একটা যান্ত্রিক ভয়ঙ্কর গর্জন! যেন এমুহূর্তে লক্ষ লক্ষ দৈত্যিদানব ছাড়া পেয়ে গেছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়ে বেড়ায়। নীল আলোর বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে উজ্জ্বল বস্তুগুলো থেকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহবস্তু একটা বৃহৎ লৌহদণ্ড থেকে আর-একটা বৃহৎ লৌহদণ্ড অভিমুখে অনবরত উড়ে উড়ে যায়। র‍্যাল্‌ফয়ের নিজের ঘড়ির চেন্ এবং ঘড়ি এতই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সেগুলো চটপট সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হন তিনি।

আলট্রা-জেনারেটর-সংলগ্ন গ্লাসহুইল আরো ঘোরাতে থাকেন র‍্যাল্‌ফ। মেশিনের গর্জন হয়ে ওঠে আরো প্রবল, আরো তীব্রতর। তারপর সমস্ত রকম আওয়াজ মিলিয়ে যায় হঠাৎ। শব্দতরঙ্গের দ্রুততা বিশ হাজার

টপ্‌কে যায়! এমন অবস্থায় মানুষের কান কোন শব্দ ধরতে সক্ষম হয় না। হুইলটাকে আরো কয়েকখাঁজ ঘুরিয়ে থামিয়ে দেন র‍্যাল্‌ফ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহবস্তুর ওড়াউড়ি ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। এমনকি সংখ্যাহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাও বিস্ময়করভাবে স্তব্ধ!

র‍্যালফ ফের চোখ রাখেন ঘড়ির কাঁটার দিকে। অতিবাহিত হয়েছে ঠিক দশমিনিট সময়। তিনি হুইলটাকে ঘুরিয়ে দেন আর এক খাঁজে। সঙ্গে সঙ্গে পিচ্‌য়ের মতো কালো অন্ধকারে তলিয়ে যায় ঘরখানা!.....

যদি কোন ব্যক্তি র‍্যাল্‌ফয়ের ল্যাবরেটরীর কাছাকাছি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে থাকত তখন, কিছু অসাধারণ ব্যাপার দৃষ্টি আকর্ষণ করত তার ঃ

র‍্যাল্‌ফ তার আল্‌ট্রা-জেনারেটরের শক্তি এরিয়ালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরিয়াল থেকে অবিরল অগ্নিশিখা 'হিস্‌ হিস্‌' শব্দ করে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক অভিমুখে। জেনারেটর-হুইল যত ঘোরাতে থাকেন র‍্যাল্‌ফ, অগ্নিশিখা আকারে বাড়ে, প্রবলতর হিস্‌ হিস্‌ শব্দ। বৃহৎ এরিয়ালগুলোর ওজনে ভারী ইরিডিয়াম তার গরম হতে হতে টক্‌টকে লাল, তারপর হলুদবর্ণ, অবশেষে তারবাহী খুঁটিসুদ্ধ চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সাদা। তারপর আর শব্দ নেই। আচমকা যেন বিশ্বচরাচর ওই দর্শকের চোখের সামনে থেকে পিচের মতো কালো অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তবুও সে উপলব্ধি করতে পারে বিদ্যুৎতারের ভেতর দিয়ে তখনও প্রবাহিত হচ্ছে একটা প্রচণ্ড শক্তি।

ঘটনাটা কী? র‍্যাল্‌ফয়ের বাড়ির এরিয়াল সাময়িক-ভাবে এমন এক আসুরিক শক্তি অর্জন করে, যার ধাক্কা সামলাতে হয় ইথার-তরঙ্গকে। প্রায় চল্লিশ মাইল ব্যাসার্ধের জন্য আকাশ-তার ইথারকে অতিদ্রুত আকর্ষণ করে। ওই এলাকায় নতুন সরবরাহে পড়ে ঘাটতি। যেহেতু আলোকতরঙ্গ শূন্যপথে ইথারের মাধ্যম ছাড়া যেতে পারে না, আকাশ-তারের প্রভাবাধীন এলাকা ডুবে যায় তখন গভীর অন্ধকারে। একই ব্যাপার শব্দতরঙ্গের বেলাতেও। দূরে দূরে স্থানে ছড়িয়ে পড়ার জন্য তারও প্রয়োজন হয় একটা মাধ্যম, বাতাস। তাপ প্রবাহের ধর্মও তাই।...

তুষার-ঝঞ্ঝার খবরটা জানতে পেরে গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েন এ্যালিসের বাবা। প্যারিস থেকে তিনি তার বিমান নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তৎক্ষণাৎ। বিমান উড়ে চলে দ্রুত-গতিতে। অবশেষে আকাশ থেকে যখন তার নিজের বাড়িটি দৃষ্টিপথে আসে, তখন তার শিরাউপশিরায় রক্ত জমে হিম হয়ে ওঠার উপক্রম! নিচের দৃশ্য যেন থামিয়ে দিতে চায় তার হৃদ্‌পিণ্ডের গতি, তিনি লক্ষ্য করেন পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে এক সুবিশাল তুষার-ধস।

বিমান যত নামতে থাকে নিচের দিকে, ওই হিমানী-সম্প্রপাতের বজ্র-নির্ঘোষ কানে এসে ধাক্কা মারে তার। তিনি জানেন, ওটার গতিরোধ করার ক্ষমতা তার হাতে নেই। আর অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডীর অসহায় দর্শক হয়ে যাবেন শুধু! এহেন সঙ্কট মুহূর্তে হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার ঘটে যায়, যেটাকে সন্তান হারানোর সম্ভাবনায় শঙ্কিত বিহ্বলকাতর পিতার কাছে মনে হয়, ওটা একটা মিরাকল, বিস্ময়কর, অলৌকিক ব্যাপার। তিনি লক্ষ্য করেন, ইরিডিয়মের আকাশ-তারগুলো ক্রমশ গরম হয়ে প্রথমে টক্‌টকে লাল, তারপর হলুদ এবং শেষে হয়ে যাচ্ছে চোখধাঁধানো অত্যুজ্জ্বল সাদা! একই সময়ে ইথারের মধ্যে কিছু-একটা সাঙ্ঘাতিক আলোড়নের আভাস উপলব্ধি করেন তিনি! নিজের বিমানের সমস্ত ধাতব অংশ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব ঘটতে দেখেন! তুষার-ধসের দিকে হেলে-থাকা একটা বিদ্যুৎ-সংযোগ-খুঁটি করছে লক্‌-লক্‌ করে অগ্ন্যুদ্গার! অগ্নিশিখার আকার-আয়তন ক্রমবর্ধমান। প্রচণ্ড চাপে হোস্‌পাইপ থেকে জল বেরুনোর মতো, অগ্নিশিখা সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে লম্বা হয়ে। তিনি অনুমান করেন ওই অগ্নিশিখার ব্যাস হবে অন্তত পনের ফিট্‌! এসময়ে তুষারধসটি অগ্নিশিখা প্রায় ছুঁই-ছুঁই করে।

এবার যা' ঘটে যায়, চোখে দেখেও তা' বিশ্বাস করা কঠিন! অগ্নিশিখার স্পর্শপাওয়ামাত্র সম্পূর্ণ হিমানী-সম্প্রপাত উষ্ণজলের স্রোতে রূপান্তরিত হতে থাকে। কলকল নাদে একটা উষ্ণ জলের ঝরণা নামে পাহাড়ের গা'-বেয়ে। হিমানী-সম্প্রপাতটি নিঃশেষ হয়ে যায় একসময়ে।

চার হাজার মাইল দূরে নিউইয়র্কে বসে তার আল্‌ট্রা-জেনারেটরের শক্তি উৎপাদন রুদ্ধ করে দেন বিজ্ঞানী র‍্যাল্‌ফ 124c 41+ নিচে নেমে পড়েন কাঁচের সিঁড়ি দিয়ে। টেলিফোটের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। দেখেন, এ্যালিস ইতিমধ্যেই নিজের যন্ত্রের মধ্যে হাজির। সে কিছুটা হতভম্ব। চোখে তার ভয়বিহ্বল দৃষ্টি। আবেগে কাঁপা কাঁপা গলায় র‍্যাল্‌ফকে শুধোয় সে, 'তুষার-ধসটা আর নেই! কী করলেন ওটাকে?' খুশিখুশি গলায় জবাব দেন র‍্যাল্‌ফ, 'গলিয়ে জল করে দিলাম।'

এ্যালিস আরো কিছু বলার আগেই খুলে যায় তার ঘরের দরজা। দৌড়ে ঘরে ঢোকেন আতঙ্কগ্রস্ত এক বৃদ্ধ! এ্যালিস তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে, বা—বা! বাবা—'

টেলিফোটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন র‍্যাল্‌ফ 124c 41+ আনন্দে সুখে খুশিতে বিজ্ঞানীর মনও ভরপুর।

[হুগো জার্নসব্যাক-এর 'দ্য অ্যাভাল্যন্স'-এর ভাবানুবাদ]

165/6, ধর্মতলা রোড, সালকিয়া, হাওড়া-6

[ছয়] খাঁচায় বন্দী মানুষ

গায়ের শব্দের মালিকদের দেখতে পেলাম একটু পরেই। এতক্ষণ যারা নিষ্ঠুর আনন্দে মশগুল থেকে গুলিবর্ষণ করে মানুষ নিধন করেছে, এখন তারাই রাইফেল রেখে দিয়ে শূন্যহাতে আসছে হাসতে হাসতে। চটুল আলাপ চলছে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে। যেন কত রঙ্গই না হয়ে গেল এইমাত্র।

দেখে গা-পিত্তি জ্বলে যাওয়ার কথা। আমি কিন্তু থ হয়ে গেছিলাম ওদের অভিজাত চালচলন দেখে।

আভিজাত্য! গরিলাদের মধ্যে আভিজাত্য! কথাটা শুনলে হাসি পাবে ঠিকই, কিন্তু হাসির কথা নয় মোটেই। খানদানি মানুষরা যেভাবে হাঁটে, যেভাবে কথা বলে, যেভাবে তাকায়—শিকারী গরিলাদের মধ্যে দেখলাম অবিকল সেই ব্যাপার।

চক্ষুস্থির হয়ে গেল সেই কারণেই।

তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম। হাতে কারও অস্ত্র নেই। সুতরাং গণহত্যা আর হবে না।

হলও না। হাতে দস্তানাপরা গরিলা অনুচররা এগিয়ে এল সামনে। আর একদল ছুঁচোলো বর্শা নিয়ে দাঁড়াল জালের পাশে। দস্তানাপরা গরিলারা জাল থেকে টেনে-টেনে বার করতে লাগল মানুষদের। কাজটা সহজ নয়। আঁচড় কামড় লাথি ঘুসির তো বিরাম নেই। দস্তানা পরেছে গরিলারা সেই কারণেই। কামড়ে কিছু হচ্ছে না। হিড় হিড় করে টেনে এনে মাথার ওপর তুলে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে পেছনে সারি সারি খাঁচা গাড়ির ভেতরে। বর্শাধারীরা খুঁচিয়ে আটকে রাখছে খাঁচায় বন্দীদের। ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত আয়েসে পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করে যাচ্ছে অভিজাত গরিলারা।

সবাইকে খাঁচায় ঢুকোনোর পর বাছাবাছি শুরু হয়ে গেল। বেছে বেছে সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে পুরুষদের একটা খাঁচায় তোলা হল। আমিও ঠাঁই পেলাম সেই খাঁচায়। নোভাকেও দেখলাম একই খাঁচায়।

ইতিমধ্যে একবার কথা বলতে গেছিলাম একজন গরিলার সঙ্গে। সে ভাবলে বুঝি দাঁত খিঁচোচ্ছি। ধাঁই করে দস্তানার ঘুসি বসিয়ে দিলে মুখের ওপর।

মনিবদের হুকুম পেতেই খাঁচাগাড়িগুলোর ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। আমার গাড়ি চালাচ্ছে একজন ছোকরা শিম্পাঞ্জী। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখছে আর টিটকিরি দিচ্ছে। মনের ফুর্তিতে গুনগুন করে গান গাইছে। সুর আছে গানটায়।

বন পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় এল খাঁচার সারি। সামনেই একটা লাল টালির ছাদ দেওয়া বাড়ি। দরজা-জানলার রঙ সবুজ। সদর দরজায় একটা প্রতীক চিহ্ন।

সরাইখানা বলেই মনে হল। শিকারীদের পানাহারের জায়গা। মহিলা গরিলারা এসে গেল একই পথে গাড়ি চেপে। মাথায় বাহারি টুপি। শিকারী গরিলাদের বউ নিশ্চয়। গাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে শুরু হল ঠাট্টা-তামাসা। একজনকে স্ট্র ডুবিয়ে সরবৎ খেতেও দেখলাম।

তারপরেই এল বাক্সর মত ক্যামেরা নিয়ে একজন ফটোগ্রাফার। নিহত শিকারদের গায়ে পা তুলে দিয়ে ফটো তুলল শিকারী গরিলারা—বউরা দাঁড়াল পাশে ঘাড় কাৎ করে। গুলিবিদ্ধ মেয়েদের মাথার চুল ঠিক করে দিল মেয়ে গরিলারা—ঠিক যেভাবে নিহত পাখিদের পালক

ঠিক করে দিই আমরা। দৃশ্যটা রক্ত জল করা সন্দেহ নেই। আমি কিন্তু আর সহ্য করতে পারিনি। হো-হো করে হেসে উঠেছিলাম ঠিক তখনি যখন দেখলাম আর্থারের ওপর পা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন অভিজাত গরিলা।

পাছে বর্শার খোঁচা খেতে হয়, তাই তৎক্ষণাৎ হাসি থামিয়ে মুখ লুকিয়েছিলাম দুই উরুর মধ্যে। হঠাৎ ঝপাং করে খাঁচার ওপর কি এসে পড়ল, দেখতে গিয়ে মুখ তুলেছিলাম।

দেখলাম তেরপলের মত বস্তু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে খাঁচা। বাইরের কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু শোনা যাচ্ছে ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ। গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ। খাঁচায় খাঁচায় তালা দেওয়ার কড়াং কড়াং শব্দ।

একটু পরেই আমাদের খাঁচা গড়িয়ে চলল গড়গড়িয়ে—জানি না কোথায়।

বেদম হয়ে পড়েছিলাম। গত দুদিনের ঘটনায় শরীর আর মন দুটোই বিকল হয়ে গেছিল। লণ্ড লুঠ আর দুই সঙ্গীর পরিণতি নিয়ে বিহ্বল হওয়ার মতও অবস্থা তখন নেই। দিন ফুরিয়ে গেল। সারা রাত ধরে ছুটে চলল খাঁচা গাড়ি। নিঝুম হয়ে পড়ে রইলাম এক কোণে। নিঃসীম হতাশার খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যেই মগজকে চালু করতে চেয়েছিলাম এই সময়ে। এই যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে চলেছে সোরোর গ্রহে অবতরণের পর থেকে, তার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলাম মনে মনে। পৃথিবীগ্রহের মানুষ আমি। কার্যকারণ নিয়ে ভাবতে পারি বলেই আমি মানুষ।

দুদিনের ঘটনাগুলো ছবির মত ভাসছিল চোখের সামনে। একটা ব্যাপার খুবই স্পষ্ট। বাঁদর বটে এরা, কিন্তু হাস্যকর নয় কেউই। সার্কাসে টুপিপরা বাঁদর দেখলে হাসি পায়। এখানে পায়নি। স্ট্র দিয়ে সরবৎ পান করেছে মেয়ে গরিলা, হাসির ব্যাপার বলে মনেই হয়নি, একজন পুরুষ গরিলাকে দেখেছি প্যান্টের পকেট থেকে টোব্যাকো পাইপ বার করে তামাক ঠেসে ধূমপান করতে। কই, হাসি তো পায়নি! যেন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার! প্রফেসার পণ্ডিত মানুষ। পাশে থাকলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা নিশ্চয় দিতে পারতেন।

যেটুকু বিজ্ঞান আমি জানি, তাই দিয়েই আশ্চর্য এই ব্যাপারটার সমাধান খোঁজবার চেষ্টা করেছিলাম। এমনও তো হতে পারে, সোরোর গ্রহের মেধাবী বাসিন্দারা বাঁদরদের কয়েক প্রজন্ম ধরে ট্রেনিং দিয়ে অবিকল মানুষের মত করে তুলেছে? পৃথিবীতে শিম্পাঞ্জীরা চক্ষু চড়কগাছ করে দেওয়ার মত খেলা দেখাতে পারে। ওদের একটা ভাষাও নাকি আছে। শুনেছিলাম একজন বিশেষজ্ঞের কাছে। তাঁর কাছেই জেনেছিলাম, বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক শিম্পাঞ্জী-গরিলাদের দিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি শুধু একটাই কারণে। কথা বলতে ওরা চায়নি। সোরোর গ্রহে কি সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে? কথা না বলতে চাওয়ার জেদ ছেড়ে দিয়ে কথা বলতে শিখেছে? মানুষদের কাজ করে দিচ্ছে তাদেরই ভাষা বলে?

মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরেছিলাম এই ব্যাখ্যাটাকেই। আর একটা ব্যাখ্যা খুব সহজ হলেও এমনই ভয়ঙ্কর যে ভাবতে মন চায়নি।

সোরোর গ্রহের প্রধান বাসিন্দা তাহলে কারা? মানুষের মত হয়েও আমার মত মানুষ খুন করায় যারা নৃশংসভাবে গরিলাদের দিয়ে, তারা কি ধরনের মানুষ? ভাবতেও গা হিম হয়ে গেছিল। বর্বরতার একটা সীমা আছে। মানুষদের যারা খুন-জখম করে, খাঁচায় পোরে তারা কি ধরনের আদিমজীব, কল্পনা করতেও শিহরিত হয়েছি।

আগামীকাল ভাগ্যে কি আছে, আর ভাবতে পারিনি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙল সকালবেলা। খাঁচাগাড়ির গতিবেগ কমে এসেছে। ঢুকছে একটা শহরের মধ্যে। খাঁচার কয়েদীরা তেরপলের তলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে বাইরে। অদ্ভুত আওয়াজ করছে ঠোঁট ফাঁক করে। পশুর মত ভয়ার্ত চিৎকার।

দেখাদেখি আমিও তাকালাম গরাদের ফাঁক দিয়ে। এবং সেই প্রথম দেখলাম সোরোর গ্রহের সভ্য শহর।

গাড়ি চলেছে বেশ চওড়া পথ বেয়ে। দুপাশে ফুটপাত। ব্যাকুল হয়ে তাকালাম পথচারীদের দিকে। নরবানর প্রত্যেকেই। সবে দোকানের ঝাঁপ খুলে কৌতূহলী চোখে একজন মুদী তাকিয়ে রয়েছে খাঁচাগাড়ির দিকে। শিম্পাঞ্জী মুদী। মোটর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে। আরোহী এবং চালকরা সবাই নরবানর। সাজপোশাক পৃথিবী গ্রহের মানুষের মতই।

সভ্য মানুষ দেখবার আশা দুরাশায় পরিণত হল এই দৃশ্য দেখে। গুম হয়ে রইলাম গাড়ি না দাঁড়ান পর্যন্ত। ফটক পেরিয়ে এসে একটা উঠোন পর্যন্ত পেরিয়ে দাঁড়াল গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল জনাকয়েক নরবানর। বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে শান্ত করতে লাগল চঞ্চল মানুষদের।

দেখলাম, মাত্র দুটো গাড়ি ঢুকেছে চত্বরে। বাদবাকি গাড়ি গেছে অন্য কোথাও।

উঠোন ঘিরে অনেকগুলো কয়েকতলা উঁচু বাড়ি। সারি সারি জানলা। একই রকম দেখতে। হাসপাতাল নিশ্চয়। সাদা আলখাল্লা পরা টুপি মাথায় আরও কয়েকজন নরবানর কাছে এসে দাঁড়াতেই বুঝলাম অনুমানটা ভুল নয়।

নরবানর প্রত্যেকেই। হয় শিম্পাঞ্জী, নয় গরিলা। সবাই মিলে টেনে হিঁচড়ে আমাদের বার করল খাঁচার মধ্যে

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে

থেকে, ঠেসে ঢোকাল প্রত্যেককে এক-একটা থলির মধ্যে, বয়ে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিনি আমি। সাদা পোশাক পরা দুজন গরিলা তুলে নিয়ে গেল আমার থলি। বেশ কয়েক মিনিট ধরে মনে হল অনেক বারান্দা পেরিয়ে যাচ্ছি, অনেক সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। তারপর দড়াম করে আছড়ে ফেলা হল আমাকে মেঝের ওপর। থলি থেকে টেনে বার করতেই দেখলাম, রয়েছি একটা খাঁচার মধ্যে চলমান খাঁচা নয়। মেঝেতে খড়ের বিছানা পাতা। একজন গরিলা তালা লাগিয়ে দিলে বাইরে।

খাঁচার মধ্যে আমি একা। এরকম খাঁচা আরও রয়েছে পাশাপাশি আর মুখোমুখি। মাঝখানে যাতায়াতের পথ। বেশির ভাগ খাঁচাতেই লোক রয়েছে। তাদের কেউ এসেছে আমারই সঙ্গে খাঁচাগাড়িতে। কেউ এসেছে আগে। আগে যারা এসেছে তারা চুপচাপ, নিঝুম—যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। দুজন করে রয়েছে এক একটা খাঁচায়। নীরবে চেয়ে রয়েছে নবাগতদের দিকে। কিন্তু নতুন যারা এসেছে, তাদের প্রত্যেককেই আলাদা খাঁচায় রাখা হয়েছে। গোঁ-গোঁ আওয়াজ করছে, গরাদ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, দাঁত খিঁচোচ্ছে নবাগতদের প্রত্যেকেই। করিডরের শেষে একটা বড় খাঁচায় রাখা হয়েছে বাচ্চাদের। নতুন মানুষ আসতেই ভীষণ উত্তেজিত তারা। গুঁতোগুঁতি করে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে আমাদের। বাচ্চা বাঁদরদের মত ঝগড়া করছে আর কিচির-মিচির করে চেঁচাচ্ছে।

গরিলা দুজন ফিরে এল আর একটা থলি নিয়ে। ভেতর থেকে নোভাকে টেনে বার করে ঢুকিয়ে দিল আমার ঠিক সামনের খাঁচায়। তালা লাগিয়ে দিতেই সে কী লম্ফঝম্প আর দাঁতখিঁচুনি। গরাদ ধরে ঝাঁকুনি। আমাকে দেখেই কিন্তু শান্ত হয়ে গেল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে।

একটু পরেই ট্রলিতে করে খাবার নিয়ে এল গরিলারা। সাদা পোশাকে দুজন গরিলা এল ট্রলির সামনে। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল নবাগতদের। বেশ সভ্যভব্যই মনে হল এই দুজনকে। আমার খাঁচার দিকে এগিয়ে আসতেই ঠিক করলাম ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করা যাক এদের সঙ্গেই।

একজন তালা খুলে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। আর একজন ঢুকল ভেতরে। ঢুকতেই বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালাম আমি। থ হয়ে গেল গরিলা মহাশয়। এরকম অবাক হতে দেখিনি কোনো নরবানরকেই।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে আরও অবাক করে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। যথাসম্ভব মিষ্টি হেসে বললাম—'কি রকম আছেন? পৃথিবী থেকে আসছি—অনেক দূরের পথ—খুব ক্লান্ত।'

যা হয় কিছু একটা বলার জন্যেই বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা হল অভাবনীয়। বিলকুল হতভম্ব হয়ে গেল শ্রোতা গরিলা। বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। কড়াংকট করে তালা লাগিয়ে দিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপরেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অট্টহাসি শুরু করে দিলে দুই গরিলাই। না জানি কত রঙ্গই জানি আমি! একজন তো পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের জল মোছা শুরু করে দিল।

দেখে গা-পিত্তি জ্বলে গেল আমার। খুন চেপে গেল মাথায়। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অন্যান্যদের মত দাঁত খিঁচিয়ে গরাদ ধরে এমন ঝাঁকুনি শুরু করলাম যে হাসি আরও বেড়ে গেল দুজনের। হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল অন্য খাঁচা-গুলোর দিকে। সবাইকে দেখা শেষ হলে আমার খাঁচার সামনে দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময়ে পকেট থেকে নোটবই আর পেন্সিল বার করে একজন টুকে নিল খাঁচার নম্বর। তালার পাশেই লেখা ছিল নিশ্চয় নম্বরটা। সেইদিকে চেয়েই লিখতে দেখলাম নোটবইতে।

কি আর করা যায়! খাওয়া শুরু করলাম গুম হয়ে গিয়ে। পায়েসের মত খাবার! মন্দ নয়। পেট ভরে গেলে বালতি থেকে খেলাম জল। [চলবে]

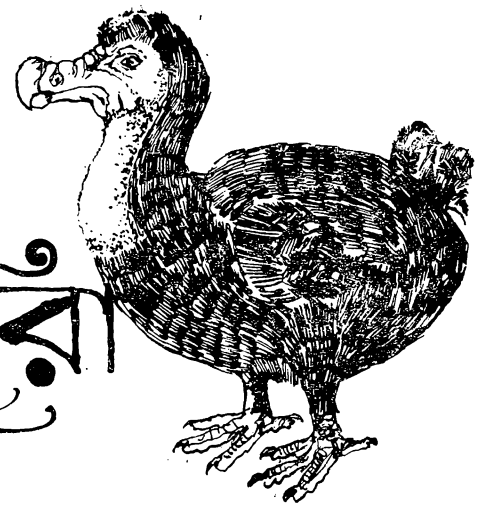

বিলুপ্ত পাখিরা

রাঠিকারঞ্জন চক্রবর্তী

সলিটেয়ার পাখি

'সলিটেয়ার' (Solitaire) বা 'নিরালা পাখি' এখন পৃথিবীর পক্ষিতালিকা থেকে বিলুপ্ত। এক সময় রোড্রি গেজ দ্বীপে এই পাখিরা বাস করত। রোড্রি গেজ দ্বীপ মরিসিয়স দ্বীপের 370 মাইল পূর্বে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপের আয়তন মাত্র 42 বর্গমাইল। প্রায় দু'শো বছর আগে এই ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রচুর 'সলিটেয়ার' পাখি দেখা যেত। আজ তাদের অস্থি ছাড়া আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ফরাসী পর্যটক লিগেট সাহেব সর্বপ্রথম 'সলিটেয়ার' পাখির বিবরণ লিখে যান। পক্ষিবিশারদ এডওয়ার্ড, নিউটন ঐ বিবরণ পড়ে রোড্রিগেজ দ্বীপে ঐ পাখির অস্থিপুঞ্জ আবিষ্কারে সচেষ্ট হন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তথ্যগুলি আবিষ্কৃত না হলে পৃথিবীর মানুষ আজ এই পাখির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কথাই জানতে পারত না।

লিগেট সাহেব 1691 খৃস্টাব্দে রোড্রিগেজ দ্বীপে প্রথম বসবাস শুরু করেন। সত্তর বছরের মধ্যে অর্থাৎ 1761 খৃস্টাব্দে এই পাখি চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

'সলিটেয়ার' একটি ডানাবিহীন পাখি। এদের আকৃতি অনেকটা বড় মোরগের মত। নানাধরনের শস্যবীজ ছিল এদের খাদ্য।

কয়েকটি বিশেষ পাখির মত এরাও বছরে একটি মাত্র অণ্ড প্রসব করত। পক্ষী ও স্ত্রী পক্ষী উভয়ে মিলে অণ্ডের ওপর অঙ্গ তাপ প্রয়োগ করত। একমাত্র প্রজনন কাল ছাড়া এরা অন্য সময় দ্বীপের মধ্যে পৃথকভাবে বাস করত। এই কারণ এদের নামকরণ হয়েছিল, 'সলিটেয়ার' বা 'নিরালা পাখি'।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সলিটেয়ারের মাংস অতি সুস্বাদু। এই মাংসের লোভেই নাবিকেরা বছরের পর বছর এদের ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়েছিল। দ্রুত ধাবনের ক্ষমতা ছিল না বলে এরা অতি সহজেই শত্রুদের হাতে ধরা পড়ত। আত্মরক্ষায় অসমর্থ 'সলিটেয়ার' এ ই ভা বে ক্র ম শঃ বিশ্বের পক্ষিতালিকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সলিটেয়ার

এডওয়ার্ড নিউটন রোড্রিগেজ দ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করে সলিটেয়ারের বহু অস্থি সংগ্রহ করেন। এই অস্থি আজও 'কেম্ব্রিজ' এবং 'সাউথ-কেনসিংটন'-এর যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

'অক' পাখি

'অক্' পাখি সাধারণত দুই জাতের,—বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র। 'বৃহৎ অক্' অনেকদিন পাখির তালিকা থেকে বিলুপ্ত। এক সময় এই পাখিদের বাসস্থান ছিল নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ও সেণ্ট কিলডা দ্বীপে। দক্ষিণ মহাসমুদ্রে যেমন আজও অনেক পেঙ্গুইন দেখা যায়, তেমনি উত্তর-আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরেও একসময় 'বৃহৎ অক্' দেখা যেত। 'সলিটেয়ার', 'পেঙ্গুইন' এবং 'ডো-ডো' পাখিদের মত এরাও

পক্ষহীন। উচ্চতায় প্রায় তিন ফুট এবং দেখতে এরা অনেকটা পেঙ্গুইন পাখির মত।

মানুষের প্রতি সরল বিশ্বাসই এদের ধ্বংসের কারণ। মানুষকে এরা কখনও ভয় করত না। এমন কি নিজেদের আক্রান্ত হতে দেখলেও ভয়ে পালিয়ে যেত না। ফলে, মানুষই নির্বিচারে হত্যা করে এদের বংশ লোপ করেছে। বৃহৎ অকের বাস দ্বীপে নাবিকেরা পদার্পণ করলে এরা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করত। সেই সুযোগে নাবিকেরা নিঃসংকোচে তাদের কাছে হাজির হয়ে লাঠির আঘাতে হত্যা করত।

মানুষের বিচারে 'বৃহৎ অক্' এক নির্বোধ প্রকৃতির পাখি। এদের মাংস সুস্বাদু। তবে এরা এতই নির্বোধ যে আত্মরক্ষা করতেও অসমর্থ। নাবিকেরা এদের ঘিরে তাড়া করলে তাদেরই জাহাজে এরা আশ্রয় নিত। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং সেণ্ট কিলডা দ্বীপের নাবিকেরা একসময় এই পাখিদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। ফলে এরা আজ বিলুপ্ত।

'বৃহৎ অক্' অন্য কয়েকটা বিশেষ জাতির পাখির মত বছরে একটি মাত্র ডিম প্রসব করত; কিন্তু সেই ডিম তারা বাসায় না রেখে পাহাড় বা তটভূমিতে রেখে দিত। ফলে, অনেক সময় সেই ডিম নষ্ট হয়ে যেত। তাদের বংশরক্ষা সম্ভবপর না হওয়ার এও একটা কারণ। পক্ষিবিজ্ঞানীদের মতে 1844 খৃস্টাব্দে 'বৃহৎ অক্' এর শেষ পাখিটি পৃথিবী থেকে চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বর্তমানে কয়েকটি ডিম ও পালক ছাড়া 'বৃহৎ অক'-এর আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। এদের ডিম দুষ্প্রাপ্য বলে অতি মূল্যবান। 1894 খৃস্টাব্দে লণ্ডনে 'বৃহৎ অক্' এর একটি ডিম 4500 টাকায় বিক্রয় হয়েছিল। ডিমের মত এই পাখির পালকও অতি মূল্যবান।

'ক্ষুদ্র অক্'-এর বাসভূমি উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগর। এরা 'বৃহৎ অক্' এর মত একেবারে বিলুপ্ত না হলেও সংখ্যায় ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। এদের ডিম কয়েকটি দেশের লোকেদের প্রধান আহার্য। বিশেষ করে উত্তর হিমকোটি অঞ্চলের লোকেরা আহার্য হিসেবে 'ক্ষুদ্র অক্' এর ডিম প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে থাকে। এই ব্যবস্থা অচিরে নিরুদ্ধ না হলে কয়েক বছরের মধ্যে 'বৃহৎ অক্'-এর মত এই পাখিও পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হবে।

অক পাখি

'ডো ডো' পাখি

মরিসিয়স দ্বীপের 'ডো ডো' পাখি আজকাল আর দেখা যায় না। পৃথিবী থেকে এরা চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে; অথচ একদিন এই 'ডো ডো' পাখিরা নির্জন মরিসিয়স দ্বীপকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিল। তিনশত বছর আগেও লোকে এই পাখির সঙ্গে পরিচিত ছিল।

আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ম্যাডাগাসকার-দ্বীপ। তার পূর্বদিকে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত মরিসিয়স দ্বীপ। এই দ্বীপের আয়তন মাত্র 720 বর্গমাইল। পোর্তুগীজরা সর্বপ্রথম এই দ্বীপ আবিষ্কার করে এবং তারাই সর্বপ্রথম 'ডো ডো' পাখির সঙ্গে পরিচিত হয়। শুধু তাই নয়, পাখির 'ডো ডো' নামটি তারাই দিয়েছিল। 'ডো ডো' অর্থে নির্বোধ। পোর্তুগীজদের আগমনের প্রায় 91 বছর পর ওলান্দাজরা এই দ্বীপে পদার্পণ করে। ততদিনে ঐ পাখির 'ডো ডো' নামটি ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে।

'ডো ডো' পাখি দেখতে মোটেই সুন্দর ছিল না। আকারে তারা গৃহপালিত টার্কির চেয়ে একটু বড়। পালকের রঙ ঘন ধূসর। ঠোঁট দুটি কাল। পায়ের গড়ন ছোট এবং হলুদ রঙের। ল্যাজ এবং বুকের পালক কিছুটা শাদাটে। এদের ডানা নেই। ফলে উড়তে পারে না। পা দু'টি ছোট বলে দ্রুত চলতে পারে না।

একসময় মরিসিয়স দ্বীপ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। 'ডো ডো' পাখিরা জঙ্গলের মধ্যে বীজ ও নানাধরনের ফল আহার করে জীবনধারণ করত। জঙ্গল হতে তৃণ লতা জড়ো করে তার ওপর ডিম প্রসব করত। 'সলিটেয়ার' ও 'বৃহৎ অক্' এর মত এরাও বছরে একটি মাত্র ডিম প্রসব করত।

পোর্তুগীজরা কোন সময় খাদ্যলোভে 'ডো ডো'-দের সংহার করেনি; বরং ওলান্দাজরাই প্রথমে মাংসের লোভে এই পাখি শিকারে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু 'ডো ডো'র মাংস তাদের ভাল লাগেনি। এমনকি অনেক চেষ্টা করেও তারা এই মাংস সুস্বাদু করে তুলতে পারেনি। তখন তারা 'ডো ডো' পাখির আর একটা নামকরণ করেছিল—'ঘৃণ্য পাখি'।

'ডো ডো' পাখির মাংস বিস্বাদ হলেও শেষ পর্যন্ত তারা নিষ্কৃতি পায়নি। ওলন্দাজরা এই দ্বীপে পদার্পণের সময় সঙ্গে কিছু শূকর এনেছিল। এই শূকরেরাই 'ডো ডো' পাখির বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল। যেহেতু তারা উড়তে পারে না এবং দ্রুত চলনেও অপারগ, সেই হেতু দিনের পর দিন শূকর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অতি সহজে বিনাশ হতে শুরু করেছিল। ওলন্দাজদের আগমনের আশী বছরের মধ্যে তারা মরিসিয়স দ্বীপ থেকে চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়ে গেল। যদি এই পাখি অন্তত সাঁতার দিতেও সক্ষম

হত, তাহলে বোধহয় আরও কিছুকাল নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারত।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'ডো ডো' পাখির দেহাংশ রক্ষিত আছে। ওলান্দাজ চিত্রকরের আঁকা কয়েকটি ছবিও বিদেশী পাঠাগার এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। প্যারী ও কোপেনহেগেন সহরের কয়েকটি শিক্ষা-নিকেতনে 'ডো ডো' পাখির অস্থি রাখা আছে। উত্তরকালে মরিসিয়স দ্বীপের এক বিস্তৃত জলাভূমি সংস্কার করা হলে পাঁকের মধ্যে 'ডো ডো' পাখির কতকগুলি অস্থি পাওয়া যায়। অস্থিগুলি সংযোজিত করে একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল তৈরি করা হয়। সেই কঙ্কালটি বর্তমানে মরিসিয়স দ্বীপের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

লেসারের কথা

দীপক কুমার দে

বর্তমানে 'লেসার' (Laser) রশ্মির কথা কারও অজানা নয়। আজ যে হারে চিকিৎসা বিজ্ঞানে, প্রযুক্তি-বিদ্যায়, শিল্পে-বাণিজ্যে লেসার ব্যবহৃত হচ্ছে তা সবারই জানার কথা। মনে রাখতে হবে লেসার রশ্মিগুলো এক বিশেষ প্রকৃতির আলোক রশ্মি। সাধারণ আলোক রশ্মির সঙ্গে এর কি পার্থক্য তা নিম্নে দেওয়া হল।

এক ঃ সাধারণ আলোক রশ্মিগুলো বিভিন্ন দিকে ছড়ায় বা বিক্ষিপ্ত হয় এবং যত দূরে যায়, তাদের তীব্রতা ততই কমে আসে। কিন্তু লেসার রশ্মির আলোক রেখা-গুলো সর্বদা এক গতিপথে যায়, তাদের তীব্রতাও সব সময় সমান অটুট থাকে।

দুই ঃ আমরা জানি আলো তরঙ্গাকারে চলে। আলোকের এক-তরঙ্গের 'শিখা' থেকে অপর 'শিখার' দূরত্ব-কে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলে। সূর্য বা বৈদ্যুতিক বাতির আলো থেকে যে সাদা আলো আমরা পেয়ে থাকি তা বিভিন্ন বর্ণালীর সমষ্টি বলে এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একরকম নয়। কিন্তু লেসার রশ্মির আলোক রেখাগুলির সকল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই হয় একদম এক মাপের। কারণ বিভিন্ন বর্ণের বা ধর্মের আলোক রেখা এতে থাকে না।

তিন ঃ সাধারণ আলোক রশ্মি কোন ধাতব পাতকে ভেদ করে যেতে পারে না। কিন্তু লেসার রশ্মিকে ধাতবপাতের উপর যদি তীব্রভাবে 'ফোকাস' করা হয় তাহলে তা ধাতব পাতকে ভেদ করে যেতে পারে। এমন কি ধাতবদ্রব্যকে বাষ্পিভূত করবার ক্ষমতা লেসারের রয়েছে।

লেসার রশ্মির এই যে এত তীব্রতা তা কি করে পেল তা বলছি। লেসার রশ্মির আলোক রেখাগুলো হয় পরস্পরের সমান্তরাল, 'একে অন্যের সঙ্গে চলে বা সমতা রেখে চলে। [কোন রশ্মির আলোক রেখাগুলো যখন পরস্পরের সঙ্গে সমতা রেখে সমান্তরালভাবে চলে, তখন তারা পরস্পরকে শক্তিশালী করে। সেজন্যই লেসার রশ্মির এত তীব্রতা] লেসার রশ্মির আলোক রেখাগুলির এই যে এত ঘনিষ্ঠতা তা লেসার যন্ত্রের (আলো বিবর্ধন **যন্ত্র**) সাহায্যে হয়।

দুর্বল বা নিস্তেজ আলোক রশ্মিকে লেসার যন্ত্রের সাহায্যে তীব্র জোরালো রশ্মিতে পরিণত করতে পারে সহজেই। এইজন্যেই কারিগরী শিল্পে ধাতবদ্রব্য ছিদ্র করার ব্যাপারে লেসার রশ্মি ব্যবহৃত হচ্ছে। মাখনের মধ্য দিয়ে যেমন কত সহজে ছুরি চালানো যায় তেমনি অবলীলাক্রমে একটি লেসার রশ্মি পুরু ধাতব দ্রব্যের মধ্য দিয়ে চলে যায়।

অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অতিসূক্ষ্ম চোখের অস্ত্রো-পচারের কাজে লেসার রশ্মি ব্যবহার করা হচ্ছে। সৈন্য-বাহিনীতেও লেসার একটি যথার্থ ও শক্তিশালী অস্ত্ররূপে গণ্য হয়।

আশা করা যায় ভবিষ্যতে লেসার (আলো বিবর্ধন যন্ত্র) বৈদ্যুতিক বা বেতার তরঙ্গের চেয়ে অধিকতর তথ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। এর সাহায্যে একটি ব্যক্তিগত বহনযোগ্য ট্রান্সিভার মারফৎ পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত পেতে সক্ষম হবে দূরদেশে বাস করেও। তবে লেসার (আলো বিবর্ধন যন্ত্রটি) নিয়ন্ত্রিত হবে গ্লাস ফাইবার দ্বারা।

এছাড়া 'লেসার রশ্মি' মহাশূন্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র তীব্রতা না হারিয়ে বা দিক পরিবর্তন না করে ছুটে যেতে পারে। তাই বর্তমানে চেষ্টা চলছে শত শত পৃথিবী প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহে যোগাযোগ স্থাপনে লেসারের সাহায্য।

C/০. অখিল চন্দ্র দে, পোঃ বেলতলা পার্ক বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর।

সচিত্র টেলিফোন

পথিক মণ্ডল

টেলিফোনে আমরা কথা বলি। যার সঙ্গে কথা বলি তাকে দেখতে পাই না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে উভয়ই উভয়কে দেখতে পায়। ব্যাপারটা খুলে বলি। যেমন রাম শ্যামকে ফোন করছে, সঙ্গে সঙ্গে T.V র পর্দায় রাম শ্যামকে দেখতে পাবে। আবার শ্যামও রামকে দেখতে পাবে তার ফোনের সঙ্গে লাগোয়া T.V.র পর্দায়।

ব্যাপারটা ভারী মজার তাই না? বিজ্ঞানীরা এই অভিনব যন্ত্রটির নাম রেখেছেন Picture phone বা সচিত্র দূরভাষ। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছে আমেরিকার বেল টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানী। এই কোম্পানীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এমন এক আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এক নতুন চমক।

তিনটি অংশ নিয়ে সচিত্র দূরভাষ তৈরি হয়েছে। যেমন পিকচার টিউব ইউনিট, কণ্ট্রোল ইউনিট এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট। পিকচার টিউব ইউনিটের গড়ন উপবৃত্তাকার। লম্বায় 30 সেণ্টিমিটার এবং উচ্চতায় 18 সেণ্টিমিটার। এই ইউনিটটি একটা স্ট্যাণ্ডের উপর থাকে। প্রয়োজনে উপরে ওঠানো ও নামানো যায়। পর্দাটির প্রস্থ হল 11 সেণ্টিমিটার এবং উচ্চতা 15 সেণ্টিমিটার। ক্যামেরা আর পর্দাটি নিয়ে এই ইউনিট গঠিত। যিনি কথা বলবেন তার মুখের কাছ থেকে এটি থাকবে প্রায় 1 মিটার দূরে। এতোটা দূরে রাখলে তবেই টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে যে কথা বলছে তার পূর্ণ ছবিটি ফুটে উঠবে। কণ্ট্রোল ইউনিটটি হল টেলিফোন যন্ত্র নিয়ে। সাধারণতঃ যে টেলিফোন আমরা ব্যবহার করি এটিও তাই। যন্ত্রটি হাতে নিয়ে কানে লাগিয়ে একই যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ করা যায়। তাছাড়া আর এক প্রকার যন্ত্র আছে সেটা হাতে ধরতে হয় না, যন্ত্রটির সামনে কথা বললেই তা যথাস্থানে পেঁাছে যায়। অন্য প্রান্ত থেকে যে উত্তর আসে মাইক্রোফোন লাউড স্পীকারের সাহায্যে তা শোনা যায়।

টেলিফোনে কথা বলার আগে আমরা যেমন নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়েল করি, এই সচিত্র টেলিফোনে তার কোন দরকার নেই। সুইচ বোতাম টিপে ডায়েল করতে হয়। প্রথমতঃ বোতাম টেপা মাত্রই পিকচার ইউনিটটি চালু হয়। তারপর কণ্ট্রোল ইউনিটের বোতাম টিপে যার সঙ্গে কথা বলা দরকার তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। যদি কেউ মনে করে যার সঙ্গে কথা বলবো তাকে দেখতে চাই না, তবে একটি বোতাম টিপে দিলেই তার ছবি দেখা যাবে না। তখন সাধারণ টেলিফোনে পরিণত হবে।

পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটটি হল সচিত্র টেলিফোনের তৃতীয় অংশ। একটি আকারে খুব ছোট। টেবিলের তলায় রাখা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার ছবি পেতে হলে উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল আলোর বিভিন্ন মাত্রার জন্য কোন অসুবিধা হয় না।

এই অভিনব যন্ত্রে সব মিলিয়ে তিন জোড়া তার আছে। এক জোড়া তার শব্দ বয়ে নিয়ে যায়, আর দু'জোড়া তার ছবি পরিবহণের কাজ করে।

দূরদর্শন যেমন ঘরে ঘরে পেঁাছে গেছে, সচিত্র দূরভাষ এখনো আমাদের দেশে তেমন দেখা যায় না। এই যন্ত্রটির মূল্য অ-নে-ক, এবং বছর বছর ব্যয়-ভার বহন করা দুঃসাধ্য। এই কারণে এটি আজও আমাদের নাগালের বাইরে। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিসে এদের দেখা মেলে।

'সত্যসদন' 159, স্টেশন রোড ইস্ট, পোঃ নিউ ব্যারাকপুর, 24 পরগনা।

বহুবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজয়ী

ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর

বিজ্ঞানভিত্তিক

কিশোর রহস্য উপন্যাস সমগ্র

মূল্য ৩৫্ টাকা মাত্র

স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৫% কমিশন

পরিবেশক ঃ

শৈব্যা পুস্তকালয়

৮।১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কল-৭৩

দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস

বাণীরূপ-অনিল কর্মকার
চিত্ররূপ-গৌতম কর্মকার

সর্বনাশ! দাদা-বৌদির খবর নেই কদ্দিন। তাঁদের কোনও বিপদ হোল না তো?
মার্চ করে সেনারা চলেছে। দলের পর দল। যুদ্ধ কি এখানেও আসন্ন?
খবরের আশায় আমার ভাই ছুটে গেল ট্রাফালগার স্কোয়ারে···
ভয় পাবেন না। মঙ্গলবাসীরা সংখ্যায় বড়জোর পনেরো। তাদের এক জন খতম হয়েছে। একশো ষোলটি ভারী কামান আমরা সাজিয়েছি। ওরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে পারবে না।
পরের দিন ভোর। এক জন অফিসার এলেন ছুটতে ছুটতে···
সাবধান! এই পথেই মঙ্গলবাসীরা আসছে। লন্ডনের ভীষন বিপদ। আপনারা যে যেভাবে পারেন আত্মরক্ষা করুন।
ভয় পেয়ে সবাই ছুটতে শুরু করলো। যে যেভাবে পারলো।
হঠাৎ দূরে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ···
ভু-উ-উ-উ-উ-স···
আগুন! আগুন! কালো ধোঁয়া। বিষাক্ত। নাকে গেলেই মৃত্যু। পালান, পালিয়ে যান সবাই।
22

বাড়ী থেকে তাই সবই দেখলো।
সবাই ছুটছে-- তার মানে-- এই পথেই কি তাহলে মঙ্গলবাসীরা আসছে!
ওদিকে ওয়েব্রিজের কাছে বেধে গেল ধুন্ধুমার লড়াই...
বুম!
বুম!
সর্বনাশ! কোন ক্ষতিই ওদের হচ্ছে না।
--জ-জ-জ-জ-জ...
বাচাও! বাচাও! হা ভগবান!
মঙ্গলবার। লন্ডন শহরের পতন হোল শেষ পর্যন্ত। ওরা শহরে এসে প্রবেশ করলো।
23

এদিকে, আমরা বসে ছিলাম নদীর ধারে, জঙ্গলের মধ্যে। আমার সঙ্গে সেই পাদ্রীসাহেব।
একি! সৈন্য! এই জঙ্গলে?
সর্বনাশ! ওরাও যে দেখছি এসে পড়েছে!
শুরু হয়ে গেল প্রবল যুদ্ধ।
দুম! দুম!
গোলার আঘাতে একটা যন্ত্রদানব লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।
যাক, একটা অন্তত পড়েছে!
কিন্তু দ্বিতীয় যন্ত্রদানব এবার শুরু করলো তাপরশ্মির বিকীরন। উঃ, মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ!
জ-জ-জ-জ...
হঠাৎ--
যন্ত্রদানবটি আকাশে হাউইয়ের মতো কী ছুঁড়ে দিল একটা। তারপর আবার-আবার--
24

অপমৃত্যু

মহঃ বরজাহান

জ্ঞান ফিরতেই দেখি শুয়ে আছি দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায়। মাথা উঁচু করে একবার চারিদিকে দৃষ্টিটাকে বুলিয়ে নিলাম। টেবিলের উপর ঢাকা দেওয়া এক গেলাস জল, একটা ট্রে তে কিছু ঔষধপত্র, অদূরে দাঁড় করানো একটা গ্যাস-সিলিণ্ডার। বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করতেই,……'না,……না,……ওঠবার চেষ্টা একদম নয়', কোথা থেকে রাজহংসীর মত পেখম মেলে সদ্য ভাঁজ ভাঙ্গা শুভ্র পোষাকে মাথায় টুপি এক লাস্যময়ী তরুণী আমাকে সযত্নে ধরে শুইয়ে দিলেন।

তাহলে আমি অসুস্থ! শুয়ে আছি কোনো হাসপাতালের শয্যায়। ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি ফিরে পেতেই সর্বপ্রথম মনে পড়ল ডক্টর জগদিন্দু স্যান্যালের কথা। আমি যার সঙ্গী ছিলাম। জানি না তিনি এখন কোথায়?

—সিস্টার, আমার কি হয়েছে?

— তেমন কিছু নয়, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।… দু'একদিন চুপ-চাপ শুয়ে থাকুন, ব্যস ……তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন।… …খিদে পেয়েছে?……একটু হরলিক্স দিই?…… না একটু গরম দুধ?

—আপাতত এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল হলেই চলবে।

সিস্টার নিজের হাতে গ্লাস ধরে জল খাওয়ালেন। তারপর রক্তিম দু'ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, 'আসি কেমন?……এই রইল কলিং বেল; প্রয়োজনে এটার উপর একটু আঙুল ছোঁয়াবেন……বাঁদী হাজির থাকবে।'

সিস্টার চলে যেতেই আমি আমার নিজের শরীরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। না, কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। সারা শরীরে একটা চিন চিনে ব্যথা। কথা বলার জোর পাচ্ছি না। ভেতর থেকে চোখ দুটো জুড়ে আসছে। হয়ত আমায় নার্কোটিকস্ ড্রাগ দেওয়া হয়েছিল।

* * *

পুরো এক সপ্তাহ পর ছাড়া পেলাম। সিস্টারকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেবিন ছাড়লাম। আমি কি হঠাৎ ভি, আই. পি. হয়ে গেলাম! হসপিটাল সুপার নিজে আমার কাঁধে হাত রেখে একান্ত বন্ধুর মত হাসপাতাল চত্বর থেকে বাইরে নিয়ে এলেন। অবাক হবার আরো বাকি ছিল।— আমাকে নিয়ে যাবার জন্য সরকারি গাড়ী! শুধুই কি গাড়ী, অভ্যর্থনা করার জন্য 'মডার্ন সায়েণ্টিফিক রিসার্চ সেণ্টারের' অধিকর্তা ডক্টর সি. এস. আয়েঙ্গার স্বয়ং দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। সম্মোহিতের মত হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। আমার হাতে আলতো ঝাকুনি দিয়ে ডঃ আয়েঙ্গার হাসতে হাসতে বললেন, 'কি ইয়ংম্যান! শরীর ঝরঝরে তো? ……উঠে বসুন, ঘরে গিয়েই আরাম করে গল্প করা যাবে, কেমন?'

বিনা বাক্যব্যয়ে পেছনের সিটে বসলাম, আয়েঙ্গার সাহেব পাশেই বসলেন। রাস্তায় কোনো কথা হল না। অবশ্য বেশি সময়ও লাগলো না। গাড়ি এসে থামল বিরাট এক আধুনিক প্রাসাদের চত্বরে। আমার হাত ধরে আয়েঙ্গার সাহেব ঢুকলেন একটা ছিমছাম বাতানুকূল ঘরে। আমাকে একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিয়ে অন্য একটা

চেয়ার টেনে নিজে বসলেন। আমরা ঠিকমত বসতে না বসতেই আগাগোড়া উর্দিপরা একজন বেয়ারা ঢুকলো, হাতের ট্রেতে দু-পেয়ালা ধূমায়িত কফি। ডক্টর আয়েঙ্গার নিজহাতে একটা পেয়ালা তুলে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্য পেয়ালাটা নিজে নিয়ে আস্তে করে বললেন, এবার আমরা আসল কথায় আসতে পারি····সেদিন ডক্টর স্যান্যাল আর আপনাকে মাদ্রাজ বিমান বন্দরে বোয়িং বিমান 909 এ তুলে দিয়ে রিসার্চ সেণ্টারে ফিরলাম। চেম্বারে গিয়ে বসতে না বসতেই ···ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং····· ফোনটা তুলে কানে রাখতেই মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। শুনলাম বোয়িং বিমানটা রান-ওয়ের মায়া কাটিয়ে সবে পাখা মেলতে শুরু করেছে পরক্ষণেই মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। আর তাতেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে— ডক্টর স্যান্যালকে হারালাম। সাথে সাথে এক বিরাট সম্ভাবনারও চির সমাধি হল। ডক্টর স্যান্যালের বাসা, আমাদের অফিসে তাঁর নিজস্ব চেম্বার, এমনকি রানওয়ের সব জায়গা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও কোনো কাগজপত্র মিলল না। যে ব্যাপারটা সম্পর্কে কথা বলার জন্য তিনি বিদেশের ঐ আমন্ত্রণ সভায় যাচ্ছিলেন তার সমস্ত কাগজপত্র সম্ভবতঃ তাঁর সাথেই ছিল।·····আমরা জানতাম

হুসপিটাল স্যুপার আমাকে বাইরে নিয়ে এলেন

তিনি একক ভাবে অদ্ভুত এক কম্পিউটর উদ্ভাবন করেছেন। সারা বিশ্বে একেবারে অভিনব।·····দেশের ভেতর থেকে তো বটেই বাইরে বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকেও প্রতিদিন অজস্র চিঠি আমরা পাচ্ছি। ডক্টর স্যান্যালের গবেষণার ব্যাপারটা সম্পর্কে সবাই দারুণ কৌতূহলী। ভবিষ্যতে ওই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণার যদি কিছু সূত্র মেলে, এই আর কি। এখন কথা হলো এ ব্যাপারে আপনি কতটুকু সাহায্য করতে পারেন?

মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসার জন্য আমার আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবো না ডক্টর স্যান্যালের বিয়োগ ব্যথা বুকে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ পাঠাবো, 'এ তুমি কি করলে'? মাথায় কিছুই এল না। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠল। মনে পড়তে লাগল সব কিছু।·····

* * *

··· ডক্টর স্যান্যাল মফস্বলে একটা কলেজের গণিতের লেকচারার। আমি সেই কলেজের গণিতেরই ছাত্র। ঘনিষ্ঠতা তখন থেকেই। তারপর পাশ করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। আর আশ্চর্য ক'দিন পরেই দেখি তিনিও হাজির, কম্পিউটর বিজ্ঞানের উপর কী সব গবেষণা করবেন। আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। কাজে-অকাজে তাঁর দরজার কড়া নাড়তাম। মাঝে মাঝে তিনিও ডাক দিতেন। কখনো বই-পত্র-পত্রিকার পাতায় লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিতেন, সেগুলি কপি করে দিতাম। আলোচনাও হতো অনেক কিছু।

একদিন শুনলাম কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি মাদ্রাজের 'মডার্ন সায়েণ্টিফিক রিসার্চ সেণ্টারে চলে গেছেন। হঠাৎ দিনদশ আগে উনি কলকাতা আসেন এবং আমাকে ডেকে পাঠান। দেখা করতেই জানতে চাইলেন আপাতত দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাবার সময় হবে কি না। আমি তো এক কথায় রাজি। অবশ্য তখনও জানি না, বাইরে বলতে উনি খোদ ভারতের বাইরে বোঝাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কোনো প্রদেশে যাবার সুযোগ-ই এযাবৎ হয়নি, হঠাৎ ভারতের বাইরে সুদূর জাপানের টোকিওতে যাবার এমন প্রস্তাব তো স্বর্গ-প্রাপ্তির সামিল। তাও আবার এক বৈজ্ঞানিকের সহকারী হয়ে। ···পরপর সাতদিন তাঁর ঘরে আমাদের সিটিং হল। আমাকে অনেক কিছু বোঝালেন। যতটুকু বুঝেছিলাম তা হলো-মানুষের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, বিরহ-মিলন, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি উত্তেজনা-স্বস্তির বিভিন্ন বিশেষ মুহূর্তে মানুষের অবচেতন মনের মধ্যে চলে নানান কথোপকথন। মস্তিষ্কে তার প্রতিক্রিয়া হয়। মস্তিষ্কের ভেতর সে সবের চুম্বকীয় ছাপ (magnetic imprint) পড়ে। যেটা পরবর্তীকালে আবার স্মৃতি হিসাবে আমরা

মনে আনতে পারি। উনি এক ধরনের সলিড ক্রস্টাল আবিষ্কার করেছেন। যেগুলি হুবহু কৃত্রিম মস্তিষ্কের কাজ করতে পারে। ঐ সলিড ক্রস্টালকে টেপের (ফিতা) আকারে এক নতুন ধরনের কম্পিউটারের ভেতর রাখা হয়। এখন মানুষের ঐ সব বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে যদি তার মাথায় একধরনের ক্যাপ পরিয়ে কম্পিউটারটি চালু করা হয় তাহলে তার মস্তিষ্কে যে সব ম্যাগনেটিক ইম্প্রিণ্ট হয় তারই হুবহু তড়িৎ-চুম্বকীয় স্পন্দনের (electromagnetic impulse) ছাপ জমা পড়ে কম্পিউটরের ফিতায়।

কম্পিউটরটির আর এক অংশে থাকে টেপের ভেতর গেঁথে যাওয়া তড়িৎ-চুম্বকীয় ছাপকে শব্দে পরিণত করার যন্ত্রপাতি এবং একটি ছোট্ট ধরনের ধ্বনি-বিবর্ধন যন্ত্র (Loud-hailer)। টেপটা বাজিয়ে শোনবার চমৎকার ব্যবস্থা।

এখন বোতাম টিপলেই ব্যস, ওই লাউড-হেইলারে শুনতে পাওয়া যাবে ঐ সব বিশেষ মুহূর্তে মানুষটির মনে কি সব চিন্তাভাবনা, কথোপকথন হয়েছিল। আর তাহলেই কেল্লা ফতে। ওটাকে হাজারো কাজে লাগানো যাবে। যেমন মনোবিকারগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসায়, দুর্ঘটনায় মরণোন্মুখ মানুষদের উপর ব্যবহার করে সেই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের কাজে, ফরেনসিক বিজ্ঞানের সামনে খুলে যাবে নব-দিগন্ত এবং এ জাতীয় আরো অনেক কিছু।

ডক্টর সান্যালকে হারানোর সাথে সাথে ভারতবর্ষ আর একটা নোবেল-পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হল, সারা পৃথিবী হারালো একটা বিরাট সম্ভাবনা।.....

—সাব, লাঞ্চ রেডি, সার্ভ করব? বেয়ারার ডাকে আয়েঙ্গার সাহেবের তন্ময়তা ভাঙলো।

শুধু আমার নয়, দেখি তাঁর চোখ দুটোও অশ্রুসজল।

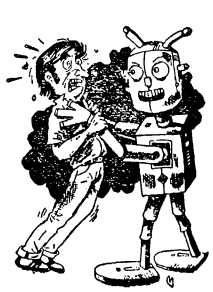

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

৫ম থেকে দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার সহযোগিতায় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। প্রতিটি পর্যায়ের প্রতিটি বিভাগের জন্য মোট 3টি করে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্পণ করা হবে। সফল প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা করা হবে মার্চ '87 সংখ্যায়। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ 31 জানুয়ারি 1987। আগামী এপ্রিল / মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার অর্পণ করা হবে। প্রতিযোগিতার শর্ত ও ফর্ম যথাযথ পূরণ করে না পাঠালে প্রেরিত রচনা বাতিল হয়ে যাবে।

৫ম ও ষষ্ঠ শ্রেণী : প্রবন্ধের বিষয় ॥ পাখি
গল্প ও প্রবন্ধ রচনার শব্দ সংখ্যা --200

৭ম ও ৮ম শ্রেণী : প্রবন্ধের বিষয় ॥ কুসংস্কার
গল্প ও প্রবন্ধ রচনার শব্দ সংখ্যা—300

৯ম ও দশম শ্রেণী : প্রবন্ধের বিষয় ॥ মহাকাশ গবেষণায় ভারত
গল্প ও প্রবন্ধ রচনার শব্দ সংখ্যা—400

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী : প্রবন্ধের বিষয় ॥ প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারত
গল্প ও প্রবন্ধ রচনার শব্দ সংখ্যা—500

পুরস্কৃত রচনাগুলি কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায় প্রকাশিত হবে। রচনা পাঠাতে হবে :

সম্পাদক : কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ
৪6/1, **মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9**

প্রতিযোগিতার কুপন

আমি..... .....বিদ্যালয়ের ..... শ্রেণীর ছাত্র। বয়স .....।

.....শ্রেণীর গল্প / প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য আমার রচনাটি পাঠালাম।

স্বাক্ষর.....

শ্রীমান..... .....বিদ্যালয়ের ..... শ্রেণীর ছাত্র।

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের স্বাক্ষর .....

স্ট্যাম্প.....

বিজ্ঞান সংবাদ

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞানকেন্দ্র

গত 2 আগষ্ট আচার্য প্রফুল্ল রায়ের 125 তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বিজ্ঞানমনস্ক জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে এক নতুন বিজ্ঞান সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। আচার্যদেবের নামানুসারে সংগঠনটির নাম হয় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞান কেন্দ্র। এই বিজ্ঞান কেন্দ্রের অন্যতম কার্যসূচী হল গণমুখীনতা। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা প্রচারের জন্য মডেল তৈরি ও নানা বিধ কুইজ প্রতিযোগিতাতেও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হবে। উৎসাহী ও আগ্রহীদের সদস্যপদের জন্য সাধারণ সম্পাদক শ্রীআশিস মান্নার কাছে আবেদন করতে হবে।

ঠিকানা ঃ **আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বিজ্ঞানকেন্দ্র মেচেদা, মেদিনীপুর** 721137।

সেলিম আলির জন্মোৎসব পালন

গত 9ই ডিসেবম্বর 1986 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সত্যেন্দ্র ভবনে পক্ষিতত্ত্ববিদ ডঃ সেলিম আলির নব্বইতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, পক্ষী বিশারদ অজয় হোম, বিজ্ঞানীর পক্ষী পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে বলেন এবং তাঁর লেখা পক্ষী বিষয়ক বই নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি "Book of indian bird" বইটির কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন ডঃ সেলিম আলিই প্রথম ভারতীয় যিনি পক্ষী নিয়ে গবেষণা করে বই লেখেন।

বিশিষ্ট অতিথি শ্রীরতন লাল ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজের আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। তিনি কিছু স্লাইড প্রদর্শনের জন্য এনেছিলেন, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা আরম্ভের মুহূর্তেই বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলের দৃশ্যগুলি দর্শক দর্শক মণ্ডলীর দেখার সুযোগ হল না। মোমবাতির আলোতেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পষিদ সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ডঃ সত্যচরণ লাহা বাংলার পক্ষী নিয়ে গবেষণা করে চারখানি বই লিখেছিলেন কিন্তু এখন সেগুলির কোন প্রচার নেই।

মহাশূন্যে আলোকচিত্র গ্রহণ এ ২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী

ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামের উদ্যোগে বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায় এক চমকপ্রদ প্রদর্শনী শুরু হ'য়েছে গত 29 নভেম্বর থেকে। পৃথিবীর মানুষ মহাশূন্যে পাড়ি জমাবার অনেক আগেই মহাশূন্যের খোঁজখবর নেবার চেষ্টা শুরু করেছিল। মহাশূন্যে ফোটোগ্রাফির এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল আজ থেকে 25 বছর আগে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে যে অগ্রগতি হয়—তারই এক চমৎকার ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদর্শনীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নিখিলবঙ্গ ব্রতচারী সমিতি

গত 20 ডিসেম্বর থেকে 24 পরগনা জেলার ব্রতচারী গ্রামে ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। চলবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষক ও যুবকবৃন্দগণ এই ব্রতচারী শিক্ষণ শিবিরে যোগ দেবেন—যার অন্যতম বিষয় হল শারীর চর্চা ও সমাজ সেবা।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ শিবির পরিদর্শন কালে বক্তৃতা দেবেন।

বিজ্ঞান, কৃষি ও গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনী

গরলগাছা বিজ্ঞান ক্লাব—বিজ্ঞান কৃষি ও গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। গ্রামীণ জীবনের অন্যান্য বিষয়ও প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞান আলোচনা ও প্রতিযোগিতা

বিজ্ঞান অন্বেষা (গুসকরা) ও A. I. S. T. A. (W.B.) এর যৌথ উদ্যোগে আগামী 1 ই জানু গুসকরা পি. পি. ইন্সটিটিউশনে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়সূচী নীচে দেওয়া হ'ল।

বৈজ্ঞানিকের জীবনী আলোচনা—পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

কুইজ কনটেস্ট—সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য

তাৎক্ষনিক বক্তৃতা—নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য

বিজ্ঞান আলোচনা—একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

নাম দেবার শেষ তারিখ 14ই জানুয়ারি। যোগাযোগের ঠিকানা অধ্যাপক ধীরাজ রায়, সম্পাদক বিজ্ঞান অন্বেষা। গুসকরা মহাবিদ্যালয়, পোঃ গুসকরা, জেলা—বর্ধমান।

পদার্থবিজ্ঞানের কথা

অজয় চক্রবর্তী

জাড্য এবং মহাকর্ষ—আমরা পদার্থের এ দুটো ধর্মের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পদার্থের অন্যান্য সাধারণ ধর্মের আলোচনার আগে পদার্থের গঠন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। বস্তুজগতের মূল উপাদান কী —বহুযুগ আগে থেকেই সে-সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছিল। সে-চিন্তাভাবনা এবং গবেষণা আজো অব্যাহত আছে। অতীতের বহু শতাব্দীর ভাবনাচিন্তা এবং গবেষণার ফলে পদার্থের গঠন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি ; যদিও পদার্থের অন্তঃপুর রহস্য এখনো পুরোপুরি উন্মোচিত হয় নি। তবে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে, কোন বস্তুই নিরবচ্ছিন্ন বা ছেদহীন নয়। সব বস্তুই ছোট ছোট কণা দিয়ে গঠিত। কোন পদার্থের যে-ক্ষুদ্রতম কণায় ঐ পদার্থের ধর্ম বজায় থাকে তাকে ঐ পদার্থের অণু বলা হয়। পদার্থের অণু আবার পরমাণুর তৈরি। অণু পদার্থের স্বাধীন কণা। পরমাণু স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে না ; অন্য পরমাণুর সঙ্গে জোট বেঁধে অণু গঠন করে। পরমাণু তড়িতাহিত কণার তৈরি—এদের কোনটির আধান ধনাত্মক, আবার কোনটির আধান ঋণাত্মক। পদার্থের অণুতে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক—দু'-ধরনের তড়িতাহিত কণাই থাকে। সমধর্মী তড়িতাধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে বলে এবং বিপরীতধর্মী তড়িতাধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে বলে পদার্থের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ—দু'ধরনের বলই ক্রিয়া করে।

আগামী সংখ্যায় লেখকের বিশেষ রচনা
'ভৌত বিজ্ঞানে বেশি নম্বর পেতে হলে'।

স্থিতিস্থাপকতা পদার্থের একটি সাধারণ ধর্ম। এ ধর্মের মূলে আছে পদার্থের অণুগুলোর পারস্পরিক আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ। পদার্থের যে-ধর্ম এর আকারগত বা আকৃতিগত পরিবর্তনের প্রয়োগকে বাধা দেয় তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। বাহ্যিক বলের প্রভাকে বস্তুর আকার গত এবং আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটলে পদার্থের অণুগুলোর আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপক বলের উদ্ভব হয়। বাহ্যিক বল প্রত্যাহৃত হলে এই অভ্যন্তরীণ বলের ক্রিয়ায় পদার্থ তার প্রাথমিক আকার বা আকৃতিতে ফিরে যায়। স্থিতিস্থাপকতা পদার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। পদার্থের এ ধর্মের নানান ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। নানান যন্ত্রপাতি নির্মাণে, অট্টালিকার কাঠামো, ধাতব সেতু ইত্যাদি নির্মাণে ধাতব পদার্থের স্থিতিস্থাপক ধর্ম কাজে লাগান হয়। স্থিতিস্থাপকতার দরুন পদার্থে শক্তি সঞ্চিত করা যায়। ঘড়ির স্প্রিং-এ দম দিলে স্প্রিং-এর স্থিতিস্থাপকতার দরুন এতে স্থিতিশক্তি জমা হয়। এই শক্তিই ঘড়িকে সচল রাখে। ধনুকের ছিলা টেনে ধনুক বাঁকালে এতে যে-শক্তি সঞ্চিত হয় সে-শক্তির মূলেও আছে ধনুকের স্থিতিস্থাপকতা। বাঁকানো ধনুকের ছিলা ছেড়ে দিলে ধনুকে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি তীরে সঞ্চারিত হয়ে সবেগে তীরকে এগিয়ে দেয়। যান্ত্রিক তরঙ্গের সঞ্চালনের জন্য স্থিতিস্থাপক মাধ্যম প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ শব্দের সঞ্চালনের জন্য একটি স্থিতিস্থাপক মাধ্যম প্রয়োজন। কোন যান্ত্রিক তরঙ্গ কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে কী বেগে সঞ্চালিত হবে তাও নির্ভর করে মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতার ওপর। যে-মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা বেশি সে-মাধ্যমে তরঙ্গের বেগও বেশি হয়। বায়ুর তুলনায় জলের স্থিতিস্থাপকতা বেশি বলে বায়ুতে শব্দের বেগের তুলনায় জলে শব্দের বেগ বেশি।

আন্তরাণবিক বল খুব অল্প দূরত্বের মধ্যে ক্রিয়া করে। অণুগুলোর দূরত্ব একটি নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করলে আর এদের মধ্যে পরস্পরিক আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে না। এ কারণেই কাচের পাত্র বা চীনামাটির পাত্র ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলে ঐ দুই ভাগ অংশকে খুঁজে খুঁজে বসিয়ে চেপে দিলে ঐ দুই অংশ লেগে যায় না। দুই ভাঙা অংশের অণুগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব আন্তরাণবিক বলের পাল্লার (range) চেয়ে বেশি হয় বলে ঐ দুই অংশ পরস্পরের টানে আটকে যায় না। কিন্তু নমনীয় পদার্থের তৈরি দুটো পৃথক বস্তুকে পরস্পরের সংস্পর্শে রেখে দিলে এরা দৃঢ়-ভাবে গায়ে গায়ে লেগে যেতে পারে। এক বর্গ সেণ্টিমিটার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট দুটো সীসার দণ্ডের দু'প্রান্ত মুখোমুখি বসিয়ে চাপ দিলে এরা যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে আটকে যায়। এভাবে আটকানো দণ্ড থেকে পাঁচ কিলোগ্রাম ভর ঝুলিয়ে দিলেও দণ্ডের অংশ দুটো বিচ্ছিন্ন হয় না (চিত্র দেখ)।

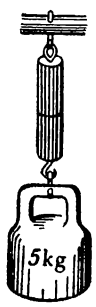

আন্তরাণবিক বল দু'জাতের—(i) আসঞ্জন (adheson) এবং (iv) সংসক্তি (cohesion)। একই পদার্থের অণু-গুলোর পারস্পরিক আকর্ষণকে বলা হয় সংসক্তি। সংসক্তি বলই একটি পদার্থের বিভিন্ন অংশকে একত্রে ধরে রাখে। কঠিন পদার্থের অণুগুলোর সংসক্তি প্রবল বলেই এরূপ পদার্থের বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য। তরল পদার্থের অণুগুলোর সংসক্তি তেমন প্রবল নয়। গ্যাসীয় পদার্থে এ বল নগণ্য। বিভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বলকে আসঞ্জন বলা হয়। আসঞ্জন বলেই আঠা কাগজের গায়ে দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়।

1987—মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

ভৌত বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

অমরনাথ রায়

পূর্ণমান = 90

[গ্রুপ-এ]

1. (ক) সংজ্ঞা লিখ ঃ

কোন বস্তুর ভর ও ভার, কার্য ও ক্ষমতা, পরমাণুর ভর সংখ্যা ও পরমাণু-ক্রমাংক, সমস্থানিক, স্ফুটন, বাষ্পায়ন, শক্তি, লীনতাপ, গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি, অ্যাভগ্যাড্রোর সংখ্যা, মৌলিক ও লব্ধ একক, শক্তির নিত্যতা সূত্র, ভরের নিত্যতা সূত্র এবং আপেক্ষিক তাপ।

(খ) চাপ বাড়াইলে জলের স্ফুটনাংকের কিরূপ পরিবর্তন হয়? হাতে ইথার ঢালিলে ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন? অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প কি? লোহার পারমাণবিক গুরুত্ব 55·85 বলিতে কি বুঝ? প্রোটনের তড়িৎ আধানের প্রকৃতি কি? উহা কি ইলেকট্রন অপেক্ষা ভারী? সি জি এস্ এবং এফ· পি· এস· পদ্ধতিতে কার্য ও ক্ষমতার ব্যবহারিক একক কি কি? পারদ থার্মোমিটারের সেলসিয়াস স্কেলে নিম্নস্থিরাংক এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক কতো? পাহাড়ের উপরে রান্না করিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় কেন, তাহা ব্যাখ্যা কর।

(গ) তামার আপেক্ষিক তাপ 0·09 বলিতে কি বুঝ? ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপের ভরসংখ্যা 238 এবং পরমাণু ক্রমাংক 92; উহার একটি পরমাণুতে নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা কতো? পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি কোথায় অবস্থান করে? প্রেসার কুকার কোন্ নীতিতে কাজ করে? তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে প্রভেদ কি? এক টুকরা ম্যাগনেসিয়ামকে পোড়াইলে দেখা যায় যে ভস্মের ওজন ম্যাগনেসিয়ামের ওজন হইতে বেশি। কেন? অভিকর্ষজাত ত্বরণের মান কতো? অক্সিজেনের একটি আইসোটোপের ভরসংখ্যা 18 এবং পারমাণবিক ক্রমাংক 8; উহার একটি পরমাণুতে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা কতো?

(ঘ) পরমাণুর কেন্দ্রকের মধ্যে কি কি কণিকা থাকে? কি অবস্থায় পরমাণু আয়নিত হইয়াছে বলা হয়? চার্লস ও বয়েলের সূত্র দুইটি লিখ ও ব্যাখ্যা কর। বরফের গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব কি? শিশিরের উৎপত্তি কিভাবে হয়? এক গ্রাম অণু বলিতে কি বুঝ? $_{11}Na^{23}$ লেখা হইতে কি কি তথ্য জানিতে পারা যায়? ধাতব পাত্রের জল অপেক্ষা মাটির পাত্রের জল বেশি ঠাণ্ডা হয় কেন? যান্ত্রিক শক্তি হইতে তাপশক্তিতে রূপান্তরের একটি উদাহরণ দাও।

[গ্রুপ-বি]

2. ক) নিউটনের গতিসূত্রগুলি লিখ। নিউটনের প্রথম গতিসূত্র হইতে আমরা কিভাবে বলের সংজ্ঞা পাই? 10 গ্রাম ভরের একটি বস্তুর উপর 50 ডাইনের একটি বল ক্রিয়া করিতেছে। বলটি কতো ত্বরণ সৃষ্টি করিবে? অভিকর্ষজাত ত্বরণের মান কতো? রকেটের কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

(খ) লিভার কাহাকে বলে? উদাহরণসহ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের বর্ণনা দাও। গতি ও স্থিতি জাড্য বলিতে কি বুঝ? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও। দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা কিরূপ হয়? নিম্নলিখিতগুলির কোনটি কোন্ শ্রেণীর লিভার তাহা কারণ সহকারে ব্যাখ্যা কর ঃ মানুষের হাত, নলকূপের হাতল, কাঁচি, যাঁতি।

(গ) আলোকের প্রতিফলনের সূত্র দুইটি লিখ। অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কি কি শর্তে ঘটে? 'সংকট কোণ' কাহাকে বলে? লঘুতর মাধ্যম হইতে ঘনতর মাধ্যমে আলোক রশ্মি কিভাবে প্রতিসৃত হয় তাহা চিত্র সহকারে বুঝাও। উত্তল লেন্সের ফোকাসের সংজ্ঞা লিখ। কোনও বস্তু উত্তল লেন্স হইতে কতদূরে রাখিলে উহার প্রতিবিম্ব অসদ্ হয়? আলোকের বিচ্ছুরণ ও বর্ণালী বলিতে কি বুঝ? একটি দণ্ডকে তির্যকভাবে জলে আংশিক ডুবাইলে কেন বাঁকা দেখায় তাহা চিত্রসহযোগে বুঝাও।

ঘ) শব্দ তরঙ্গ বায়ুতে কিরূপে বিস্তার লাভ করে তাহা চিত্র সহযোগে বুঝাও। সুরযুক্ত শব্দের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। তাহারা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা লিখ। শব্দের প্রতিফলনের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ কর। প্রতিধ্বনি কিভাবে উৎপন্ন হয়? শব্দ কি শূন্যের ভিতর দিয়া যাইতে পারে? একটি পরীক্ষা উল্লেখ করিয়া তোমার যুক্তি প্রমাণ কর। শব্দের কম্পাঙ্কের ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এককগুলি কি কি?

3. (ক) ওরস্টেডের পরীক্ষা বর্ণনা কর। ওহমের সূত্র লিখ। ইলেকট্রিক ফিউজ কিভাবে কাজ করে তাহা বুঝাও। একই উপাদানে নির্মিত একটি সরু ও একটি মোটা তারের দৈর্ঘ্য সমান। কার রোধ বেশি ও কেন? ক্যাথোড রশ্মি ও এক্স রশ্মি কাহাকে বলে? উহাদের উপর তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাব কিরূপ? কোন পরিবাহীর রোধ ১ ওহ্ম। উহার ভিতর দিয়া 2 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ

চলিতেছে। উহার প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে বিভব প্রভেদ কতো? তড়িৎ চুম্বকের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লিখ।

4. নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কি ঘটে সমীকরণ যোগে প্রকাশ কর ঃ

(i) সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করা হইল।

(ii) গাঢ় ও উত্তপ্ত নাইট্রিক অ্যাসিডে এক টুকরা জ্বলন্ত কাঠ কয়লা ফেলা হইল।

(iii) শীতল ও লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড তামার উপর ঢালা হইল।

(iv) স্বচ্ছ চুন জলে প্রথমে অল্প ও পরে অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবাহিত করিলে কি হয়?

(v) নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়া লিখ।

(vi) ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সহিত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটানো হইল।

(vii) ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের সহিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটানো হইল।

(viii) গাঢ় ও তপ্ত সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত কপারের বিক্রিয়া ঘটানো হইল।

5. (ক) নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি ব্যালেন্স কর ঃ

$Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$

$MnO_2 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$

$Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$

$MgO + HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$

(খ) নিচের বিক্রিয়াগুলিতে কোন্‌টি জারিত ও কোনটি বিজারিত হয়েছে, তা যুক্তিসহ লেখ ঃ

$PbS + 4H_2O_2 = PbSO_4 + 4H_2O$

$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

$H_2O_2 + 2KI = 2KOH + I_2$

(গ) পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত যৌগগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির নাম লিখ ও বিক্রিয়ার সমীকরণ দাও ঃ

(i) নাইট্রিক অ্যাসিড (ii) অ্যামোনিয়া (iii) H_2S

(ঘ) জায়মান হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা বেশি সক্রিয়—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য একটি পরীক্ষা উল্লেখ কর। H_2 এবং 2H এর মধ্যে পার্থক্য কি? মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র লিখ। ঐ সূত্রের সংশোধিত রূপটি লিখ। প্রশমন ক্রিয়া বলিতে কি বুঝ? অনুঘটক কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।

নিম্নলিখিতগুলির প্রত্যেকটির একটি করিয়া ভৌত ধর্ম ও ব্যবহার উল্লেখ কর ঃ—কস্টিক সোডা, তুঁতে, ব্লিচিং পাউডার, কাপড় কাচা সোডা এবং খাদ্যলবণ

নিম্নলিখিত যৌগগুলির উৎস ও দুইটি করিয়া ব্যবহার লিখ ঃ—ক্লোরোফর্ম, ইউরিয়া, বেঞ্জিন, কেরোসিন।

সমযোজ্যতা ও তড়িৎ যোজ্যতার সংজ্ঞা লিখ। নিচের কোন্‌টি তড়িৎযোজী ও কোনটি সমযোজী যৌগ?

(i) NaCl (ii) CH_4 (iii) H_2O (iv) $CaCl_2$ (v) CCl_4

লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা ও তামার একটি করিয়া আকরিকের নাম লিখ। উপাদানগুলি উল্লেখ করিয়া পিতল, ব্রোঞ্জ ও জার্মান সিলভারের পরিচয় দাও ও ব্যবহার লিখ।

6 (ক) পর্যায় সারণীর দুইটি ব্যবহার লিখ। ক্লোরিন হাইড্রোজেন ও আর্গন পর্যায় সারণীর কোন্ গ্রুপে থাকে?

(খ) অ্যাসিড মিশ্রিত জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করা হইল। ইহা কিরূপ পরিবর্তন তাহা যুক্তিসহ লিখ।

মোমবাতির দহন কিরূপ পরিবর্তন, তাহা যুক্তিসহ লিখ।

(গ) রাসায়নিক সমীকরণ হইতে আমরা কি কি বিষয় জানিতে পারি না? বর্ষাকালে খাদ্যলবণ ভিজিয়া যায় কেন?

(ঘ) তড়িৎ বিশ্লেষণ বলিতে কি বুঝ? দুইটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের নাম লিখ।

(ঙ) জৈব ও অজৈব যৌগের তিনটি পার্থক্য উল্লেখ কর।

(চ) 96 গ্রাম অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে কতো গ্রাম $KClO_3$ প্রয়োজন হইবে?

(K = 39, Cl = 35·5, O = 16)

কতো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সহিত লঘু HCl এর বিক্রিয়ায় 6 CO_2 উৎপন্ন হইবে?

(Ca = 40, C = 12, O = 16)

72 গ্রাম জল উৎপাদন করিতে কতো গ্রাম হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হইবে? (H = 1, O = 16)

(ছ) লোহিত-তপ্ত লৌহের উপর দিয়া স্টীম পরিচালনা করা হইলে কি ঘটিবে তাহা সমীকরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

(জ) 'শুষ্ক বরফ' কি? উহা কি কাজে লাগে?

অমরনাথ রায় প্রণীত

পঞ্চাশটি অভিনব বিজ্ঞানের খেলা

সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস (শীঘ্রই প্রকাশিত হবে)

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

ঐচ্ছিক রসায়নের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

অমরনাথ রায়

[ক বিভাগ]

1. যথাযথ উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর ঃ

(i) সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত দ্রবণ (ii) ধাতু ও অধাতু (iii) মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ (iv) ঊর্ধ্বপাতন (v) তুল্যাংকভার (vi) অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প ও অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা (vii) বাষ্প-ঘনত্ব (viii) গুণানুপাত সূত্র (iv) অনু-ঘটক (x) অন্তর্ধূম পাতন (xi) প্রশমন ক্রিয়া (xii) কেলাসন (xiii) দ্রাব্যতা (xiv) যোজ্যতা (xv) পারমাণবিক গুরুত্ব।

2. জারণ ও বিজারণ বলিতে কি বুঝ উদাহরণ সহযোগে বুঝাও। প্রমাণ কর যে জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া একই সঙ্গে ঘটে। জারক ও বিজারক দ্রব্য কাহাকে বলে? প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

3. খর ও মৃদু জল বলিতে কি বুঝ? জলের খরতার কারণ কি? স্থায়ী ও অস্থায়ী খরতার কারণ কি? এমন একটি পরীক্ষা উল্লেখ কর, যাহার দ্বারা জলের স্থায়ী ও অস্থায়ী খরতা একই সঙ্গে দূর হয়। জলের সহিত CaO, Na, Na_2O, SO_2 এবং CO_2 এর বিক্রিয়া কেমন হয় তাহা সমীকরণ সহযোগে লিখ।

4. কিরূপে নিম্নলিখিতগুলির তুল্যাংকভার নির্ণয় করিবে? (i) ম্যাগনেসিয়াম (ii) কপার (iii) জিংক

যোজ্যতা, পারমাণবিক গুরুত্ব ও তুল্যাংকভারের মধ্যে সম্পর্কটি নির্ণয় কর। একটি ধাতুর অক্সাইডে 60% ধাতু আছে। ধাতুটির তুল্যাঙ্কভার কতো?

5. হেবার পদ্ধতিতে কিভাবে অ্যামোনিয়ার পণ্যোৎপাদন করা হয়? আমাদের দেশের সিন্দ্রীর সার কারখানায় অ্যামোনিয়াম সালফেট কিভাবে উৎপাদন করা হয়? অ্যামোনিয়ার দ্রবণকে ধীরে ধীরে কপার সালফেট দ্রবণে যোগ করিলে কি ঘটে?

6. প্রমাণ কর যে বায়ু মিশ্র পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নহে। জ্বলন্ত ফসফরাসের উপর বেলজার ঢাকা দিলে কি হইবে? জলের স্ফুটনাংক 100°C বলিতে কি বুঝ? কার্বনের রূপভেদগুলির নাম ও ব্যবহার লিখ। $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ সমীকরণটি হইতে কি কি জানা যায় এবং কি কি জানা যায় না?

চার্লস ও বয়েলের সূত্রগুলি লিখ এবং উহা হইতে গ্যাস-সমীকরণটি গঠন কর। পরম শূন্য ও উষ্ণতার পরম স্কেল কাহাকে বলে? 27°C উষ্ণতায় এবং 750 m.m. চাপে 5 লিটার নাইট্রোজেন পাইতে হইলে কতোটা অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট প্রয়োজন হইবে?

7. 'নির্দেশক' কাহাকে বলে? প্রমাণ দ্রবণ কাহাকে বলে? 10% কস্টিক সোডা দ্রবণের প্রমাণ মাত্রা কতো?

18c.c. $\left(\frac{N}{2}\right)$ HCl দ্রবণ, 20·6 cc. (N) HCl দ্রবণ এবং 16·4 cc. $\left(\frac{N}{10}\right)$ HCl দ্রবণ মিশ্রিত করা হইল। মিশ্র দ্রবণের নর্ম্যাল মাত্রা কতো হইবে?

[খ বিভাগ]

8. পরীক্ষাগারে কিরূপে H_2S গ্যাস প্রস্তুত করিবে? এই গ্যাস প্রস্তুতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় না কেন? কি হয় তাহা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর ঃ

(i) ক্লোরিন জলের সহিত H_2S এর বিক্রিয়া।

(ii) কপার সালফেট দ্রবণের সহিত H_2S এর বিক্রিয়া।

9. পরীক্ষাগারে CO_2 গ্যাসের প্রস্তুত প্রণালী লিখ। ইহার ধর্ম ও ব্যবহারগুলি উল্লেখ কর। প্রমাণ কর যে CO_2 গ্যাসে কার্বন আছে।

সমীকরণ সহ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কি ঘটে তাহা ব্যাখ্যা কর ঃ (i) শুষ্ক কলিচুনের উপর দিয়া Cl_2 গ্যাস পরিচালনা করা হইল (ii) কপার ও গাঢ় H_2SO_4-কে উত্তপ্ত করা হইল (iii) লোহিত তপ্ত লৌহের উপর দিয়া স্টীম পরিচালনা করা হইল (iv) MnO_2 এবং গাঢ় HCl-এর মিশ্রণকে উত্তপ্ত করা হইল

10. নিম্নলিখিত যৌগগুলির প্রস্তুতি বর্ণনা কর এবং প্রত্যেকের একটি করিয়া ব্যবহার লিখ ঃ

(i) প্লাস্টার অফ প্যারিস (ii) গ্লবার লবণ (iii) ফেরাস সালফেট (iv) কপার সালফেট (v) কস্টিক সোডা।

11. আকরিক হইতে কিরূপে নিম্নলিখিত ধাতুগুলিকে নিষ্কাশন করিবে তাহা সংক্ষেপে সমীকরণ সহ লিখ।

(i) তামা (ii) জিংক (iii) অ্যালুমিনিয়াম

'গ্যালভ্যানাইজেশন' কাহাকে বলে?

সল্‌ভে পদ্ধতিতে কিরূপে সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত করিবে?

12. ক্ষারকীয় মূলক জিংক, কপার, অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যাসিড মূলক সালফেট ও ক্লোরাইড কিভাবে শুষ্ক ও সিক্ত পরীক্ষা দ্বারা সনাক্ত করিবে?

খনিজ ও আকরিকের মধ্যে পার্থক্য কি? ধাতুমল কাহাকে বলে? লৌহ নিষ্কাশনের সময় মারুৎচুল্লীর ভিতরে যে বিক্রিয়াগুলি ঘটে সেগুলি সমীকরণ সহযোগে লিখ। কাস্ট আয়রন, রট আয়রন এবং স্টীলের মধ্যে প্রভেদ কি?

ভূগর্ভের সম্পদ টারকুইজ

অমরনাথ রায়

ভূ-বিজ্ঞানীরা যে খনিজ পদার্থটিকে 'টারক্যুইজ' নামে অভিহিত করে থাকেন, রসায়ন বিজ্ঞানীদের ভাষায় তা হলো জল, তামা ও সংযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট $[Cu\ Al_6\ (PO_4)\ (OH)_8\ .\ 4-5H_2O]$। মোজ স্কেলে এর কাঠিন্য 5 থেকে 6. এটিও একটি রত্নপাথর এবং বাংলায় একে আমরা 'ফিরোজা' নামে অভিহিত করে থাকি। এর স্ফটিক দুর্লভ। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এর যে ক'টি স্ফটিক মেলে, তা আকারে ক্ষুদ্র ও প্রিজমাকৃতি হয়। স্ফটিক সাধারণত কাচের মত স্বচ্ছ হলেও তা নানান্ রঙের হয়। গাঢ় নীল, ফিকে নীল, আকাশী-নীল, নীলাভ সবুজ, সবুজাভ-পার্টাকিলে এবং অ্যাপ্‌ল গ্রীন রঙের টারক্যুইজ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। এর স্ফটিকের গা মোমের মতন মসৃণ হয়। অ্যালুমিনিয়াম-যুক্ত শিলার সঙ্গে তার উপরকার স্তরের জলের বিক্রিয়ায় এই খনিজটি উৎপন্ন হয়। ভার্জিনিয়া, কলোরাডো, নেভাদা, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, মিশর, সোভিয়েত রাশিয়া এবং ইরানে এই খনিজটি পাওয়া যায়। সৌন্দর্য, স্থায়িত্ব, দুষ্প্রাপ্যতা এবং সহজে বহনক্ষম—এই চারটি গুণ সবরকম রত্ন পাথরেরই সাধারণ ধর্ম। টারক্যুইজ বা ফিরোজার মধ্যে এই সব গুণ দেখা যায় বলে রত্ন-পাথর হিসাবে এরও যথেষ্ট সমাদর আছে। কোন কোন ফিরোজার কেলাসের মধ্যে মাকড়সার জালের মত বাদামী রঙের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন 'ফিরোজা' ছিদ্রবহুল হয়।

বিশ্বের জীবজন্তু আলপাকা

দক্ষিণ আমেরিকায় চার শ্রেণীর উট ও ভেড়ার আদলযুক্ত প্রাণী দেখা যায়। এদের সবারই বাস আণ্ডিজ পর্বতমালায়। তবে এক এক শ্রেণীর প্রাণী বাস করে এক এক উচ্চতায়। এই চার শ্রেণীর বিচিত্র-দর্শন প্রাণীর মধ্যে লামা আর আলপাকাদের পোষ মানানো যায়। আণ্ডিজ পর্বতমালার সর্বোচ্চ অংশে আলপাকারা দল বেঁধে বাস করে। প্রচণ্ড তুষারপাতেও এদের কোন কষ্ট হয় না, কারণ এদের সর্বাঙ্গ অতি সুন্দর মিহি লোমে ঢাকা থাকে। পূর্ণবয়স্ক একটি আলপাকার গায়ের লোম এত লম্বা হয় যে, অনেক সময় তা মাটি পর্যন্ত স্পর্শ করে। আলপাকার লোম বেশ মোলায়েম এবং হাল্‌কা, গরম তো বটেই।

প্রতি দুই বছর অন্তর এক একটি আলপাকার দেহ থেকে কম করে চার কিলোগ্রাম উল (লোম) পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা সেই উল দিয়ে গরম পোশাক বানায়। নিজেরা পরে। অন্যত্র তা চালান দেয়। আর এই কারণেই স্থানীয় লোকেরা আলপাকাকে আদর যত্নে প্রতিপালন করে—যেমনটি আমরা করে থাকি ভেড়ার ক্ষেত্রে। আলপাকারা সাধারণত সাত-আট বছর বাঁচে। ঐ সময়টুকুর মধ্যে এক একটি আলপাকার দেহ থেকে বড়জোর তিন কি চারবার লোম কাটা হয়। আর এই লোম বা পশম অতি উৎকৃষ্ট।

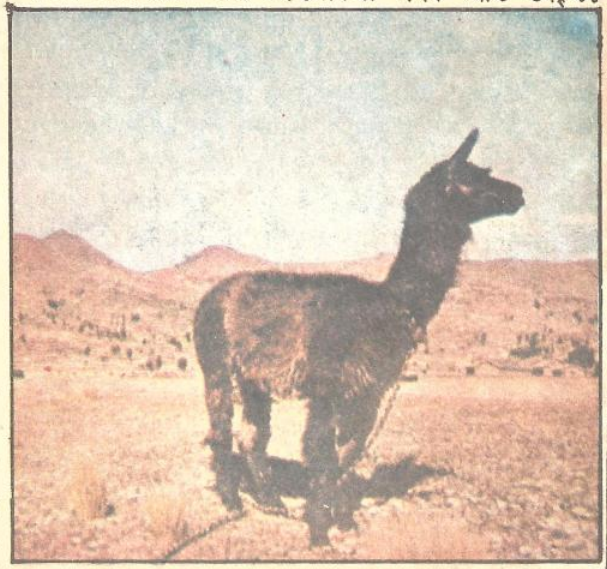

ফার গাছের কোন্ আর ছুঁচলো মুখো প্যাঙ্গোলিন

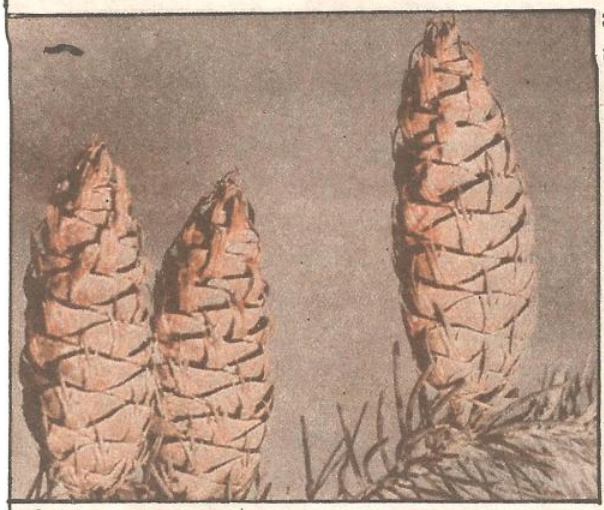

উপরের ছবিটি হল ডগ্‌লাস ফার (Douglas Fir) গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত কোন্ (Cone)। 'কোন্' হল নগ্নবীজ বা জিম্‌নোস্পারম্ শ্রেণীর উদ্ভিদের জননাঙ্গ। কোনটি তৈরি হয়েছে পরপর শক্ত পাতার মত স্পোরোফিল দিয়ে। যেহেতু এরা নগ্নবীজ শ্রেণীর উদ্ভিদ, এদের বীজ এই শক্ত স্পোরোফিলের ওপর খোলা অবস্থায় থাকে, কোনো ফলের মধ্যে সযত্নে ঢাকা থাকে না। সুসময়ে এই আ-ঢাকা বীজগুলো মাটিতে পড়ে নতুন গাছের জন্ম দেয়।

উপরের ছবির সঙ্গে নিচের ছবির কোথায় যেন দারুণ মিল। নিচের ছবিটা হল সারা গা শক্ত আঁশে ঢাকা ছুঁচলোমুখ প্যাঙ্গোলিন (Pangolin)। শিকারীর চোখে ধুলো দিয়ে রক্ষা পাবার এই উপায়কে বলে 'মিমিক্রি'। প্রকৃতি রাজ্যে এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। ঠিক একই কৌশলে যুদ্ধের সময় সৈন্যরা যখন বন্দুক নিয়ে দল বেঁধে এক সীমানা থেকে অন্য সীমানায় এগোয় তখন দূর থেকে শত্রুপক্ষ তাদের অবস্থিতি যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য তারা গাছ-পাতার ছাপ দেওয়া জামা কাপড় পরে।

প্যাঙ্গোলিনের বৈজ্ঞানিক নাম ম্যানিস ক্র্যাসিকাউডেটা (Manis Crasscaudata)। পাওয়া যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। এছাড়াও আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে এরা থাকে। প্রায় আট ধরনের প্রজাতির (species) প্যাঙ্গোলিন আছে, যারা 3-6 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় ছুঁচলো মুখ থেকে লেজ অবধি ধরলে। এদের শক্তিশালী লেজটি দেহের প্রায় অর্ধেক। এরা দিনের বেলা ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে আর সন্ধেবেলা বেরোয় খাবারের খোঁজে। পিপঁড়ে অথবা উইপোকা খেয়ে বেঁচে থাকে তাই এদের বলা হয় অ্যান্ট ইটার বা পিপীলিকাভুক। এদের সামনের পা খুব শক্ত এবং মাটি খুঁড়ে পিঁপড়ে বার করবার জন্য বেশ ধারালো নখ আছে। কোন কারণে ভয় পেলে এরা গোল হয়ে গুটিয়ে একটা বলের মত হয়ে যায়, তখন আর কোন মতেই বোঝবার উপায় নেই যে এটা একটা প্রাণী।

ব্যাপক অপচয়, অপব্যবহার ও দূষণের ফলে বন্যজীবন আজ বিপর্যস্ত। প্রত্যক্ষভাবে প্রাণিহত্যা ও পরোক্ষভাবে অরণ্যের উচ্ছেদের ফলে ভারতের বহু প্রাণী আজ বিপদ-গ্রস্ত। এই বিপদগ্রস্ত প্রাণীদের তালিকায় প্যাঙ্গোলিনের নামও পাওয়া যাবে।

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

বুদ্ধিশুদ্ধির পাতায় ধাঁধার উদ্দেশ্য হবে যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চা। আচ্ছা, একটা ধাঁধা বলি এবার।

তিনটি গ্লাস নাও। আর নাও এগারোটা মার্বেল বা একই রকমের এগারোটা পয়সা। এবার পয়সাগুলোকে গ্লাসে এমনভাবে রাখো যাতে প্রতিটি গ্লাসে বেজোড় সংখ্যায় থাকে। অর্থাৎ 1, 3, 5, 7 ইত্যাদি। খুব একটা সমস্যাই নয়, তা না? নানাভাবে রাখা যাবে। 3, 7 আর 1টা করে এক এক গ্লাসে রাখলেই হল। কিন্তু যদি বলি 10টা পয়সা নিয়ে তিনটি গ্লাসে রাখো একই নিয়মে। অর্থাৎ প্রতি গ্লাসে বেজোড় সংখ্যায়। এবার কিন্তু সত্যি সমস্যা। তবে তারও সমাধান হয়ে যাবে। তোমার বুদ্ধিটাকে একটু অন্যভাবে কাজে লাগাতে হবে। একটু দুষ্টু-বুদ্ধি আর কি। ধরো তুমি 1, 2 আর 7টা করে রাখলে এবং 1 পয়সার গ্লাসটা 2 পয়সার গ্লাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। এখন ব্যাপারটা কি হল লক্ষ্য করা যাক। একটি গ্লাসে তিনটি পয়সা দেখতে পাবে আর একটিতে 7টি। তিন পয়সার ক্ষেত্রে একটি গ্লাসের মধ্যে আর একটি গ্লাসও দেখতে পাবে। তাতে কী?

খুব একটা খুশি হলে না মনে হচ্ছে। একটু ফাঁকিবাজী মনে হচ্ছে তাই না? তা ফাঁকি দেওয়ার জন্যও ত একটু বুদ্ধি খরচ করতে হয়। ঠিক আছে আর একটা না হয় ফাঁকিবাজীর গল্পই বলি এবার।

একটি ছেলে প্রায়ই স্কুলে আসছে না দেখে স্কুলের বড়বাবু একদিন তাকে ধরলেন। তা ছেলেটি একটি হিসেব দেখিয়ে বড়বাবুকে বোঝালো যে তার স্কুলে আসার সময়ই সে পাচ্ছে না। হিসেবটা যা দেখালো তা দেখে বড়বাবু ত থ।

"আমি দিনে আট ঘণ্টা ঘুমাই। অর্থাৎ সারা বছরে ঘুমের হিসেব হল $8 \times 365 = 2920$ ঘণ্টা। 24 ঘণ্টায় দিন। সুতরাং $2920 \div 24 = 122$ দিন।

শনি আর রবিবার স্কুল বন্ধ সুতরাং সেগুলো একসঙ্গে 104 দিন।

বছরের লম্বা ছুটি 60 দিন।

খাওয়ার জন্য অন্তত দিনে 3 ঘণ্টা সময় লাগে। তার জন্যে $3 \times 365 = 1095$ ঘণ্টা বা $1095 \div 24 = 45$ দিন।

খেলাধূলার জন্য 2 ঘণ্টা। তার মানে $2 \times 362 = 730$ ঘণ্টা। $730 \div 24 = 30$ দিন মোটামুটি।"

তারপর ছেলেটি সবগুলো একসঙ্গে যোগ দিল। $122 + 104 + 60 + 45 + 30 = 361$ দিন। আর হিসেবটা দেখিয়ে বড়বাবুকে বলল—"দেখুন আর ত মোটে 4 দিন আছে হাতে। তাও ত অন্যান্য ছোটখাটো ছুটিছাটা যোগই করিনি। সুতরাং স্কুলে আসার সময় কোথায় আমার?"

তোমরাও কি ছেলেটির ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত?

আগামী সংখ্যায় তোমাদের মতটা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা কোরো।

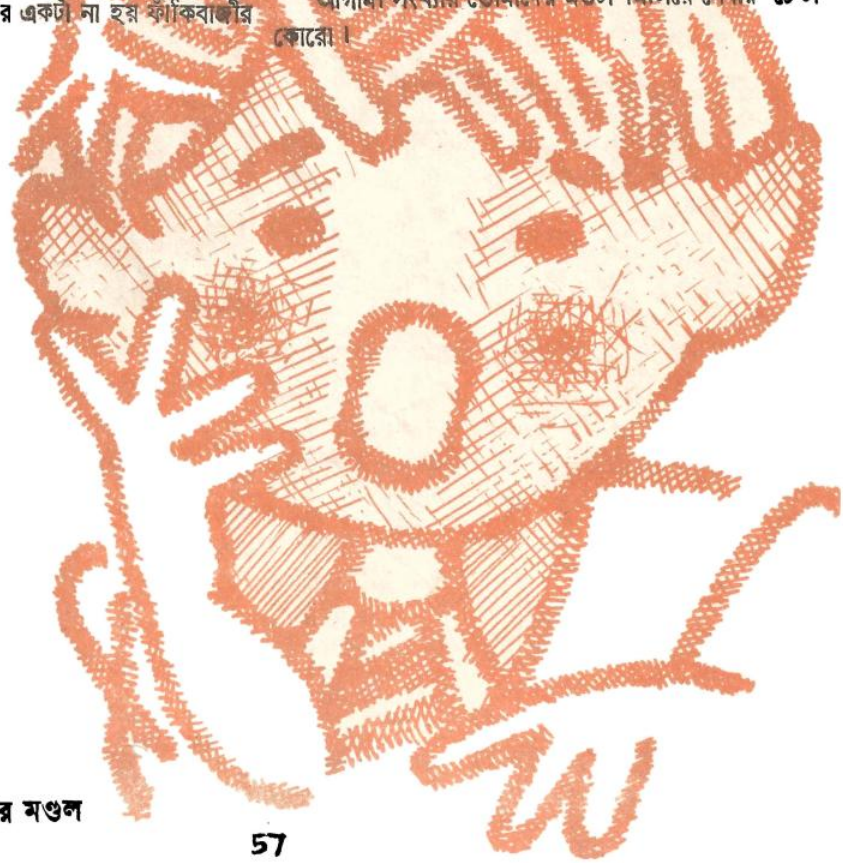

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

ক্যুইজ কনটেস্ট

জানুয়ারী 1987

মান : IX—X

1. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মস্থান কোথায় ?
2. লাক্ষা দ্রবীভূত হয় কোন্ দ্রাবকে ?
3. বিশ্বের দীর্ঘতম কাব্য গ্রন্থটির নাম কি ?
4. সোডিয়াম সিলিকেট যৌগের অপর নাম কি ?
5. পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহে মোট হাড়ের সংখ্যা কতো ?
6. C. I. D. কথার অর্থ কি ?
7. 'প্লাস' কোন শ্রেণীর লিভার ?
8. 'ব্রোমিন' মৌলটি কোন্ সালে আবিষ্কৃত হয় ?
   (ক) 1800 (খ) 1826 (গ) 1900
9. 'ডয়টেরিয়াম'-এর আবিষ্কর্তা কে ?
10. কোনও বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে কতো গতিবেগে উপরে নিক্ষেপ করলে তা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না ?
11. লিভার।
12. বেষ্টিত কন্দ।

আই-কিউ-টেস্ট—জানুয়ারী '87

1. গ্রুপ A-তে কয়েকটি স্থানের নাম এবং গ্রুপ Bতে কয়েকটি শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তোমরা গ্রুপA-এর সঙ্গে গ্রুপ B-কে মিলিয়ে দাও—

গ্রুপ A—হীরাকুদ, লুধিয়ানা, কেরল, মহীশূর, উত্তর প্রদেশ, বিহার, আসাম।

গ্রুপ B—চা, কয়লা, শীতবস্ত্র, রেশম, অভ্র, চামড়া অ্যালুমিনিয়াম।

2. কোন সংখ্যার 10% এর 25% যদি 20 হয়, তবে সংখ্যাটি কত ?

3. বলত, কোন 'টেবিল',-এর পায়া নেই ?

4. উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন্ যৌগের দ্রাব্যতা প্রথমে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু 32°C উষ্ণতার পর হ্রাস পেতে থাকে ?

(a) পটাসিয়াম ক্লোরাইড, (b) লেড নাইট্রেট, (c) সোডিয়াম সালফেট, (d) পটাসিয়াম নাইট্রেট।

5. বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণরত কৃত্রিম উপগ্রহে আর্কিমিডিসের নীতি প্রযোজ্য হবে কি ?

(a) হ্যাঁ, (b) না, (c) আংশিকভাবে প্রযোজ্য।

ফটো ক্যুইজ

জানুয়ারী 1987 মান : IX—X

আকাশের অনেক উঁচুতে ঘুরেবেড়ানো নিচের পাখিটির দৃষ্টি কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত যায়। প্রধান খাদ্য জীবজন্তু। পাখিটার নাম কি ?

অক্টো-নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের সমাধান

1. হর্ষবর্ধন। 2. ত্যাগের প্রতীক। 3. 1939 খ্রিষ্টাব্দের 3রা সেপ্টেম্বর। 4. আমেদাবাদ। 5. নান্দু নাটেকার, 1961 সালে। 6. 746 ওয়াট। 7. 112 লিটার। 8. প্রেসার কুকার। 9. জিম্বেরেলিন্স। 10. S. I. units. 11. আবদুল গফুর খানকে।

সিনিয়র ফটো ক্যুইজের সমাধান : নটিলাস

আই-কিউ টেস্ট অক্টো-নভেঃ 86-এর সমাধান

1. (a) লর্ড রিপন কর্তৃক।
2. (d) অসংখ্য।
3. (b) অ্যালভিওলাইতে।
4. (d) জন স্মল।
5. News।

হাঁচোড় দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

অক্টোঃ-নভেঃ 86'-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা সার্টিফিকেট পাবে :

1. অপূর্ব কুমার সামন্ত, প্রযত্নে, নবকৃষ্ণ বেতাল, এফ. সি. আই. কম্পাউন্ড, সিপাহী বাজার, মেদিনীপুর-721101
2. অর্কজ্যোতি মিশ্র, প্রযত্নে, নিখিলেশ্বর মিশ্র, 125, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলকাতা-700 009
3. গৌতম মজুমদার, প্রযত্নে, পি. কে. মজুমদার, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্স, অভয়কানন, বোরহাট, পোঃ—নূতনগঞ্জ বর্ধমান-713104
4. দেবজ্যোতি পানি, প্রযত্নে, সুনীলকুমার পানি, B2-80-2 ভি. কে. নগর, দুর্গাপুর, বর্ধমান-713210
5. রুনু নিয়োগী, প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী, গ্রাম—পানপুর, ডাক—নারায়ণপুর, ভায়া—কাঁকিনাড়া, উত্তর 24-পরগনা, পিন-743126
6. শিপ্রা পাল, প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল, পোঃ—চাকদহ (নেতাজী পার্ক), নদীয়া
7. অরিন্দম দাসমাজী, প্রযত্নে, সরোজকুমার দাশমাজী, পোঃ+গ্রাম—রানিয়া গোবিন্দপুর, 24-পরগনা
8. ইন্দ্রনীল মৌলিক, প্রযত্নে, এস. এন. মৌলিক, কোয়ার্টার নং—S/II/13 Unit—3, নিউ ডেভলপমেণ্ট, পোঃ খড়্গপুর মেদিনীপুর।
9. সুমন ব্যানার্জী, প্রযত্নে, সুদর্শন ব্যানার্জী, পোঃ+গ্রাম—গোপীনাথপুর, ভায়া—দুর্গাপুর, বর্ধমান—713201
10. বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, প্রযত্নে, শ্যামসুন্দর বিশ্বাস. কবি ভুজঙ্গ ধর রোড, পোঃ—বসিরহাট, উত্তর 24-পরগনা

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. বাণীকুমার মাইতি, ও. ডি. আর. সি. গভঃ হাউসিং এস্টেট, R/S-3, বেহালা, কলকাতা-700 073
2. শুভঙ্কর বিশ্বাস, 4, বিবেকানন্দ রোড, পোঃ নবব্যারাকপুর, উত্তর 24-পরগনা-743276
3. মহুয়া দাঁ, প্রযত্নে, মৃণালকান্তি দাঁ, পোঃ+গ্রাম—জামালপুর, বর্ধমান।

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে।

কলকাতা : জয়ন্ত ধর, শুক্লা চৌধুরী।
24-পরগনা : পল্লবসবুজ দাশ, মনোজিৎ মণ্ডল, সৌমেন ভৌমিক, অরিন্দম দাশমাজী, জয়ন্তী মিত্র, ইন্দ্রনাথ মল্লিক, তপনকুমার মন্ডল, পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য, বাণীব্রত সরকার।
হাওড়া : ডরোথি ঘোষ, অপর্ণা বিশ্বাস। হুগলী : সুরজিৎ সাহা।
বর্ধমান : গার্গী পানি, তরুণ তপন গরাই। মেদিনীপুর : অপূর্বকুমার সামন্ত, ইয়াসমিন বেগম।
নদীয়া : অনিরুদ্ধ সরকার। বাঁকুড়া : রূপাঞ্জন সাহা, অরুণাভ কুণ্ডু, দার্জিলিঙ : ধ্রুব দাসমহলানবীশ।

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **শ্রীকুমার দে**, প্রযত্নে, হরিনারায়ণ ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনী, নবপল্লী, বারাসত, উত্তর 24-পরগনা।
2. **রূপম ভৌমিক**, প্রযত্নে, প্রসন্ন ভৌমিক, গ্রাম—নারায়ণপল্লী, উত্তর 24-পরগনা, পিন-743178।
3. **অনির্বাণ দত্ত**, প্রযত্নে, প্রদীপ কুমার দত্ত, 4/16, আফতার মস্ক লেন, কলকাতা-700 027।

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এ সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

24-পরগনা ঃ বাপী দাস। **বর্ধমান ঃ** কুন্তল রায়, স্নিগ্ধা উপাধ্যায়। **মেদিনীপুর ঃ** প্রদীপ দাস। **নদীয়া ঃ** অনিরুদ্ধ সরকার। **মুর্শিদাবাদ ঃ** ইন্দ্রজিৎ সাহা। **আসাম ঃ শিলচর, কাছাড় ঃ** পল্লব নাথ।

অক্টোঃ-নভেঃ'86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **পুলিন বিহারী সাউ**, গ্রাম ইন্দা, বোসপাড়া, পোঃ ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর-721305।
2. **শ্রীদাম সরকার**, প্রযত্নে, বৈকুণ্ঠ সরকার, গ্রাম মিলন নগর, পোঃ বগুলা, নদীয়া-741502।
3. **শ্রাবণী গরাই**, প্রযত্নে, শরৎকুমার গরাই, গুসকরা, বর্ধমান।

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ অচিন্ত্যকুমার রায়, গৌতম দে, জয়ন্তী ব্যানার্জী, অনিন্দ্য দাস, কৌশিক বাগচি, আশিস মণ্ডল। **হাওড়া ঃ** শ্যামল সাধু খাঁ, বরুণ বিশ্বাস। **24-পরগনা ঃ** অনুপম দাশমাজী। **হুগলী ঃ** অনুপম বসু সরকার, রাজেশ শেঠ, সৌম্য ভট্টাচার্য। **বর্ধমান ঃ** মণিদীপা দাঁ, মোহনলাল চক্রবর্তী, দেবজ্যোতি পানি, অমিত দাস, মুরারিমোহন রক্ষিত। **মেদিনীপুর ঃ** সুপর্ণা বেতাল, অপরাজিতা দত্তমজুমদার, অভিজিৎ সরকার, দিলীপ দাস, মসিউর রহমান, শান্তনু দিন্দা। **বীরভূম ঃ** প্রদীপ্ত সেনগুপ্ত। **মুর্শিদাবাদ ঃ** কাফিল আলম সিদ্দিকী।

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফোটো ক্যুইজের সঠিক উত্তর করে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **শ্রাবণী কুণ্ডু**, প্রযত্নে, এম. আর কুণ্ডু, 7/F, রিমাউণ্ড রোড, কলকাতা-700 027।
2. **মনোজিৎ দত্ত**, প্রযত্নে, রঞ্জিত দত্ত, হসপিটাল কোয়ার্টার রোড, কারবালা, রুম নং-9, সেকেণ্ড ফ্লোর, হুগলী।
3. **পার্থ চক্রবর্তী**, নবম শ্রেণী, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, 24-পরগনা।

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফোটো ক্যুইজের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ সোনালী চ্যাটার্জী, সুজয় মণ্ডল। **উত্তর 24-পরগনা ঃ** বিপ্লব সবুজ দাশ। **বর্ধমান ঃ** দেবব্রত পাইন, অসীমা ব্যানার্জী। **মুর্শিদাবাদ ঃ** জয়ন্ত সরকার। **পঃ দিনাজপুর ঃ** অশোককুমার দাশ।

অটো পাওয়ার সাপ্লাই

অভিজিৎ বিশ্বাস ও সুবীর ঘোষ

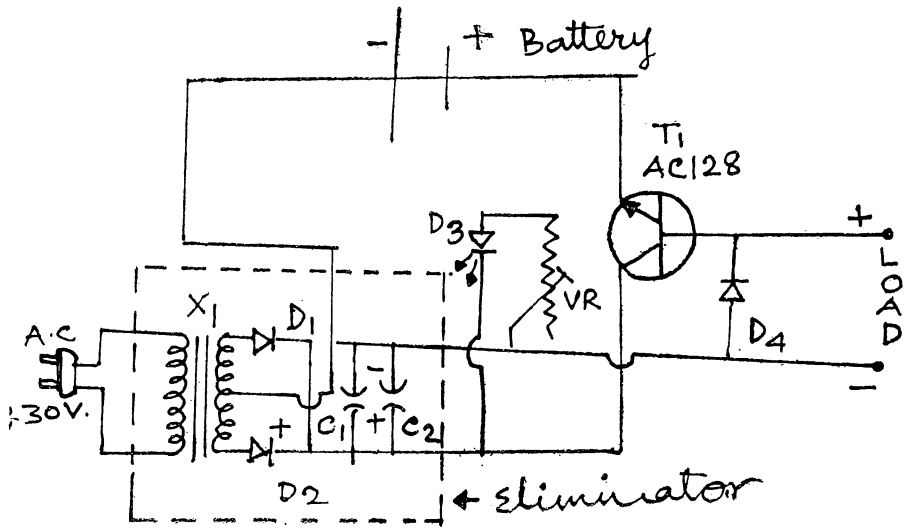

যাঃ বাবা ! হলো তো ?

কি আবার ! লোডশেডিং !!

পাড়ার ন্যাপলাদার গানের গলাটা টেপ-রেকর্ডিং করে বন্ধুদের মধ্যে নাম কেনার ইচ্ছাটা অনেক দিনের। ফাঁকে-তালে বসিয়েছি। কিন্তু 'সে গুঁড়ে বালি'। ঝুপ করে লোডশেডিং। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ব্যাটারি লাইনে টেপ চালানোর মধ্যেই হৃদয় জয় করা ন্যাপলাদার গলার কাজ চৌদ্দ আনাই সারা।

তিরিক্ষে মেজাজে এই ঘটনার আদোপান্ত শ্রাদ্ধ করে বৈজ্ঞানিক পাঁচুদার কাছ থেকে মস্ত একটা প্ল্যান আদায় করে আনলাম। ঠিক নিচের সার্কিটের মত।

Component list :

X_1 = Step down transformer
pre.—230V. AC / Sec.—0 – 12 V.DC
$D_1 - D_2$ = Diode— 1N 4001
C_1—C_2 = 1000μ/16V.

Or, Eliminator

T_1 = AC 128 with Heat Sink
D_4 = 1N 4001
D_3 = L.E.D. (Red)
VR = Priset—1k

এখানে মূল কাজ T_1-এর / এই P.N.P. ট্রানজিস্টরটি সুইচিং করছে। D_3 L. E. Dটি না জ্বললে বোঝা যাবে Mains (AC 230V) অফ্। তখন লোড্ (ট্রানজিস্টর টেপ ইত্যাদি) ব্যাটারির ভোল্টেজ পাবে। 1K প্রিসেট-টিকে ম্যাচিং করে জ্বালাতে হবে। আবার, প্রিসেটের পরিবর্তে 220k/0·5 watt রেজিস্টার দিয়ে AC-তে লাগানো যেতে পারে। D_4-কে ব্যবহার করা হয়েছে Load-কে (বিশেষ করে I. C. দিয়ে তৈরি মডেল) রক্ষা করার বিশেষ তাগিদে। যদি Eliminator বা Battery Supply থেকে বিপরীত বিভবপ্রভেদ প্রয়োগ করা যায় তবে LOAD-এর সাপ্লাই অফ্ হয়ে যাবে।

এবার, LOAD লেখা তার দুটির নেগেটিভ সাপ্লাইটি LOAD-এর নেগেটিভে ও পজিটিভে (LOAD-এর ব্যাটারির পজিটিভ কানেক্শন কেটে দিতে হবে) লাগিয়ে দিলেই কাজ শেষ।

এবার আর লোডশেডিং-এ বিরক্ত হওয়ার কারণ নেই। Mains থাকলে LOAD Eliminator থেকে power supply পাবে এবং Mains off থাকলে LOAD Battery থেকে Supply পাবে অটোম্যাটিক্যালি।

হ্যাঁ, আমি তাই ঠিক করেছি আর একবার এবং শেষবার ন্যাপলাদাকে বিরক্ত করব।

বিঃ দ্রঃ এই মডেলে 0—16V. supply দেওয়া যাবে।

শব্দকূট সুজনবন্ধু সামন্ত

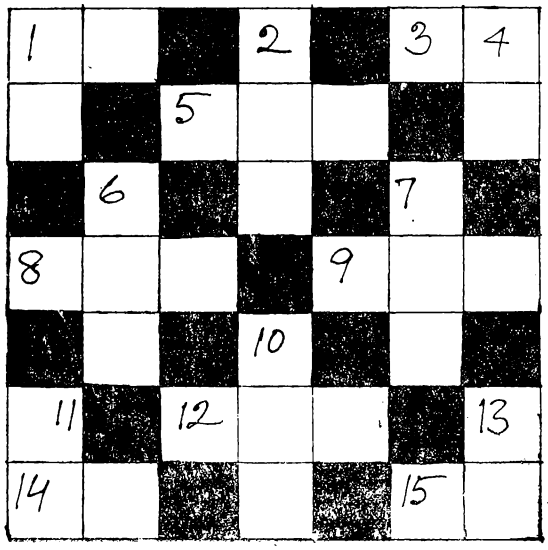

পাশাপাশি ঃ—1. যে ফলের বিজ্ঞানসম্মত নাম Musa sapientum। 3. যে ফসলের বৈজ্ঞানিক নাম Oryza sativa। 5. যে উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম Tectona grandis। 8. যে প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম Mus musculus। 9. যে ফুলের বিজ্ঞানসম্মত নাম Datura fastuosa। 12. যে গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Occimum sanctum। 14. যে শস্যের বিজ্ঞানসম্মত নাম Triticum sativum। 15. যে মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Anabas testudineus।

উপর-নিচ ঃ—1. যে গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Coffea arabica। 2. যে মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Clarius batrachus। 4. যে প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম Homo sapiens। 6. যে স্তন্যপায়ীর বিজ্ঞানসম্মত নাম Pteropus edulis। 7. যে মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Catla catla। 10. যে চিংড়ির বিজ্ঞানসম্মত নাম Palaemon carcinus। 11. যে শস্যের বিজ্ঞানসম্মত নাম Phaseolus aureus। 13. যে মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Labeo rohita।

প্রযত্নে, সুশীলকুমার সামন্ত, গ্রাম—কিসমত জগন্নাথ চক, পোঃ—মাগুরী জগন্নাথ চক, পাঁশকুড়া আর. এস. এস. মেদিনীপুর।

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

জানুয়ারি সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টে উপহার

অমরনাথ রায়ের

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা

জানুয়ারি সংখ্যার ফটো ক্যুইজের উপহার

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ঘনাদার জুড়ি নেই

গত এক বছরে প্রকাশিত সিনিয়র, জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, ফটো ক্যুইজ ও আই কিউ টেস্টের সফল প্রতিযোগীদের এপ্রিল-মে '87 মাসে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্পণ করা হবে।

—সম্পাদক

প্রতিযোগিতার কুপন

সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট, এবং ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

ঠিকানা.....

বয়স..... শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম.....

আই কিউ টেস্ট / সিনিয়র / জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তর পাঠালাম।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড তড়িৎযোজী পদার্থ নয় কেন? সুতীর্থ পাল, মাথাভাঙ্গা-কোচ বিহার।

উঃ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুর মত সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাসের জন্য যখন একটি পরমাণু তার সর্বশেষ কক্ষ থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বর্জন করে এবং সেই বর্জিত ইলেকট্রন অন্য পরমাণু তার সর্বশেষ কক্ষে স্থান দিয়ে যে যৌগ গঠন করে তখন ঐ যৌগ গঠনের ক্ষমতাকে বলা হয় তড়িৎ যোজ্যতা এবং যে সব যৌগ উক্ত তড়িৎযোজ্যতার মাধ্যমে গঠিত হয় তাদেরই বলা হয় তড়িৎযোজী।

কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) যৌগটি উপরোক্ত গ্রহণ-বর্জন নীতির দ্বারা গঠিত নয়। যেহেতু একটি কার্বন পরমাণু ও দুটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড অণু গঠিত হয়, তাই রাসায়নিক সংযোগের সময় কার্বন পরমাণু (সর্বশেষ কক্ষে থাকে 4টি ইলেকট্রন) গঠন করে দুটি করে ইলেকট্রনের দুটি যুগল। অপরপক্ষে দুটি অক্সিজেন পরমাণুর (সর্বশেষ কক্ষে থাকে 6টি ইলেকট্রন) প্রত্যেকে দান করে দুটি ইলেকট্রনের একটি করে যুগল। তাই এখানে দুটি অক্সিজেন পরমাণু ও একটি কার্বন পরমাণু প্রত্যেকেই ইলেকট্রন যুগলগুলির সমান অংশীদাররূপে যৌগ গঠন করছে এবং বাহিরের কক্ষে প্রত্যেকেই 8টি করে ইলেকট্রনের বিন্যাসের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুর মত সুস্থিরতা অর্জন করছে। অতএব এটি সমযোজী যৌগ।

প্রঃ মৌলের ভর সংখ্যা ও পারমাণবিক গুরুত্বের মধ্যে সম্পর্ক কি? হৃষিকেশ ঘোষ, নারাণা, ডোমজুড়, হাওড়া।

উঃ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে মূল উপাদান হিসাবে বিদ্যমান থাকে প্রোটন ও নিউট্রন (হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে থাকে মাত্র একটি প্রোটন কণিকা)। উভয় কণিকার ওজনও প্রায় সমান। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সম্মিলিত ঐ প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যাই তার ভর সংখ্যা। অর্থাৎ পরমাণুর ভর সংখ্যা = ওর নিউক্লিয়াসে অবস্থানকারী প্রোটনের সংখ্যা + নিউট্রনের সংখ্যা।

কিন্তু পারমাণবিক গুরুত্ব একটি তুলনামূলক সংখ্যা মাত্র। আগে বিশ্বের সবচেয়ে হাল্কা পদার্থ হাইড্রোজেনের তুলনায় কোন মৌলের পরমাণু যতগুণ ভারী তাকেই পারমাণবিক গুরুত্ব ধরা হতো। এক্ষেত্রে যে কোন পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব ও ভরসংখ্যা একই। বর্তমানে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে অক্সিজেনের পরমাণুর (ভর সংখ্যা 16) $\frac{1}{16}$ অংশের তুলনায় যতগুণ ভারী সেই তুলনামূলক সংখ্যাটিকেই পারমাণবিক গুরুত্ব ধরা হয়। তথা পারমাণবিক

$$\text{গুরুত্ব} = \frac{\text{মৌলের একটি পরমাণুর ওজন}}{\text{অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভরের } \frac{1}{16}}$$

প্রঃ আলো ছাড়া উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে সমর্থ হয় না কেন? রাজু সরকার, তরঙ্গপুর হাইস্কুল—পশ্চিম দিনাজপুর।

উঃ আলোকের প্রভাবে গাছের সবুজ পাতা উদ্দীপিত হয়। এই অবস্থায় পাতার পত্ররন্ধ্র খুলে যায় এবং বড় হয়ে ওঠে। তখনই বায়ুস্থিত কার্বন ডাই অক্সাইড পাতায় প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। ফলে পত্রস্থিত ক্লোরোফিলের সাহায্যে মূল দ্বারা প্রেরিত রস, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং উৎপন্ন হয় শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ও অক্সিজেন।

প্রঃ কত উচ্চতা পর্যন্ত জল তোলা যায় এবং কেন? সোমনাথ বটব্যাল, বাবুডমরো হাইস্কুল—কর্তিয়া—মেদিনীপুর।

উঃ সাধারণ পাম্পের সাহায্যে 34 ফুট উচ্চ পর্যন্ত জল তোলা যায়। কারণ বায়ুমণ্ডলের যে চাপ তাতে 34 ফুট উঁচু পর্যন্ত জলস্তম্ভকে ধরে রাখতে পারে। পারদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বাভাবিক বায়ুর চাপ কেবলমাত্র 76 সেমি পারদস্তম্ভকে ধরে রাখে। যেহেতু পারদ জলের চেয়ে 13·6 গুণ ভারী। তাই জলের ক্ষেত্রে হয় $76 \times 13 \cdot 6$ সেমি বা 34 ফুট।

প্রঃ এরোপ্লেন উড়ে যাওয়ার সময় মাটিতে ছায়া ফেলে না কেন? বিশ্ববন্ধু দাস, সাউথ হিল কলোনি—লামডিং—আসাম।

উঃ যেহেতু সূর্য আলোক প্রভব, এরোপ্লেন অস্বচ্ছ বস্তু এবং পৃথিবীর উপরিভাগ পর্দার কাজ করে। এরোপ্লেন মাটি থেকে অনেক উপরে থাকে বলে ওর দ্বারা গঠিত প্রচ্ছায়া শঙ্কুটা মাটিকে স্পর্শ করতে পারে না অর্থাৎ মাটি থেকে অনেক উপরেই শেষ হয়ে যায়। তাই ছায়া পড়ে না পৃথিবীতে। কিন্তু যদি খুব নিচু দিয়ে যায় উপরোক্ত শর্তানুযায়ী ছায়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়বে।

প্রঃ প্রেসার কুকারে মাংস, তরিতরকারি প্রভৃতি ভাল সেদ্ধ হয় কেন! সুজিত পাল, 28/15, ভারতী রোড—দুর্গাপুর 5।

উঃ চাপ বৃদ্ধিতে জলের স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায় এবং স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পেলেই যে কোন জিনিস ভালভাবে সেদ্ধ হয়। প্রেসার কুকারে কৃত্রিম উপায়ে চাপ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই জলের স্ফুটনাঙ্ক 100° সে. অপেক্ষাও বেড়ে ওঠে।

প্রঃ বায়ুকে মিশ্র পদার্থ বলা হয়, জলকে কেন বলা হয় না? সিদ্ধেশ্বর দাস, আদরপাড়া—জলপাইগুড়ি।

উঃ মিশ্র পদার্থ তাকেই বলা হয়—যার মধ্যে উপাদান-

গুলির স্ব-স্ব ধর্ম বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে উপাদানগুলি বিশেষ অনুপাতে যুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ধর্ম-বিশিষ্ট এক নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে এবং তার মধ্যে উপাদানগুলির কোন একটিও গুণ বা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না।

জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্বারা গঠিত হলেও এর মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের কোন ধর্ম বিদ্যমান থাকে পরন্তু-নতুন ধর্মের উদ্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে এবং অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে। কিন্তু জল ও সব কিছুই করে না বরং আগুনকে নেভাতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে মিশ্র পদার্থের মধ্যে উপাদানগুলি যে কোন অনুপাতে যুক্ত হয় এবং কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু যৌগিকের ক্ষেত্রে উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়।

প্রঃ কালো বস্তু সূর্যের তাপ বেশি ও দ্রুত শোষণ করে উত্তপ্ত হয়। তবু ছাতার কাপড় কালো করা হয় কেন? **গঙ্গাধর নন্দী,** বসিরহাট কলেজ পাড়া—উত্তর 24 পরগণা।

উঃ কালো বস্তু একদিকে যেমন উত্তম শোষক অপর-দিকে তেমনই উত্তম বিকিরকও। ছাতার পৃষ্ঠদেশ আবার **উত্তল**। তাই সূর্য তাপ সহজে বিকীর্ণ হয়ে যেতে পারে এবং বিকীর্ণ তাপ বায়ুর ভেতর দিয়ে চলাফেরা করার সময় বায়ুকে উত্তপ্তও করে না।

প্রঃ লোহা, ইস্পাত, নিকেল প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু-ছাড়া চুম্বক অন্য কিছুকে আকর্ষণ করে না কেন? **অমিতাভ সেন,** বেনাডারুই-হুগলী।

লোহা, ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ এবং কতকগুলি সঙ্কর ধাতুকে চৌম্বক পদার্থ বলা হয়। কারণ, এদের মধ্যে চৌম্বক ধর্ম প্রবল। অর্থাৎ অতি দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারাও এরা প্রভাবিত হয়। কাঠ, কাগজ প্রভৃতি প্রভাবিত হয় না বলে অচৌম্বক পদার্থ বলা হয়। তবে দেখা গেছে, প্রায় সব পদার্থই শক্তিশালী চুম্বকের দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হয়।

প্রঃ ভারী জলের সঙ্কেত কি এবং ভারী জলের সঙ্গে সাধারণ জলের পার্থক্য কোথায়? (১) চঞ্চল কর্মকার, কুশমণ্ডী—পশ্চিম দিনাজপুর এবং (2) প্রণব ভট্টাচার্য, বিপাশা পট্টনায়ক, লালু পট্টনায়ক ও মধু সামন্ত—মহিষাদল—মেদিনীপুর।

উঃ ভারী জলের সঙ্কেত D_2O (ডয়টেরিয়াম অক্সাইড বা ভারী হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্বারা গঠিত যৌগ)।

ভারী জল সাধারণ জলের মত বর্ণহীন তরল হলেও অত্যন্ত জলাকর্ষী। উভয় ধরণের জলের মধ্যে ভৌত ধর্মের যথেষ্ট পার্থক্য। সাধারণ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1, হিমাঙ্ক 0°C, স্ফুটনাঙ্ক 100°C এবং 4°C-এ সর্বাধিক ঘনত্ব। কিন্তু ভারী জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·1076, হিমাঙ্ক 3·82°C, স্ফুটনাঙ্ক 101·42°C এবং 11·6°C এ সর্বাধিক ঘনত্ব। এছাড়া সাধরণ জল ও ভারী জলের তলটান (25°C, ডাইন প্রতি সেমি) যথাক্রমে 71·97 ও 71·93। আয়নীয় গুণাঙ্ক (25°C) সাধারণ জলের 1×10^{-14}, কিন্তু ভারী জলের $30{\cdot}3 \times 10^{-14}$। এছাড়াও আরও কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রঃ সূর্যালোক কি? অশোক নন্দী, পহলানপুর—বর্ধমান।

উঃ সূর্য থেকে আগত বিদ্যুৎ চৌম্বক রশ্মিগুলির অন্যতম এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে কোন অসুবিধা হয় না। সাধারণত চোখের স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে সূর্যের 8×10^{-5} সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে 4×10^{-5} সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তি তরঙ্গগুলি যে অনুভূতি সৃষ্টি করে তাকেই বিভিন্ন রঙের দেখতে পাই। যেমন 4×10^{-5} সেমি থেকে $4{\cdot}5 \times 10^{-5}$ সেমি তরঙ্গ দৈর্ঘের আলো বেগুনী, $4{\cdot}5 \times 10^{-5}$ সেমি থেকে 5×10^{-5} সেমি তরঙ্গ দৈর্ঘের আলো নীল, 5×10^{-5} সেমি থেকে $5{\cdot}7 \times 10^{-5}$ সেমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো সবুজ, $5{\cdot}7 \times 10^{-5}$ সেমি থেকে $5{\cdot}9 \times 10^{-5}$ সেমি হলুদ, $5{\cdot}9 \times 10^{-5}$ সেমি থেকে $6{\cdot}2 \times 10^{-5}$ সেমি কমলা এবং $6{\cdot}2 \times 10^{-5}$ সেমি থেকে $7{\cdot}5 \times 10^{-5}$ সেমি লাল।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম সে তত বেশি শক্তিশালী।

প্রঃ আইসোটোপ কি এবং সব পদার্থের কি আইসোটোপ আছে? সব্যসাচী আগরওয়াল—ফরাক্কা—মুর্শিদাবাদ।

উঃ যে সমস্ত পরমাণুর রাসায়নিক ধর্মাবলী অভিন্ন কিন্তু পারমাণবিক ভর ভিন্ন তাদের আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, পর্যায়সারণীতে ক্রমাঙ্ক অনুসারে প্রত্যেক মৌলের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। যে সব ভিন্ন ওজনের মৌলের একই ক্রমাঙ্ক, তাদের সারণীতে একই স্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হয়। উক্ত কারণে যে সব মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব পৃথক হওয়া সত্ত্বেও একই ক্রমাঙ্ক তাদের সমস্থানিক বা একস্থানিক মৌলও বলা হয়।

প্রকৃতিতে সাধারণত তেজস্ক্রিয় মৌলের আইসোটোপ বেশি পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন, নিয়ন, কার্বন, ক্লোরিন প্রভৃতি মৌলের আইসোটোপও পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে যে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। যেহেতু আইসোটোপগুলির ক্রমাঙ্ক একই তাই প্রোটন সংখ্যা অভিন্ন। ভর বিভিন্ন হওয়ায় নিউট্রন সংখ্যা এক নয়। তাই কৃত্রিমভাবে নিউক্লিয়াসে নিউট্রন সংযুক্ত করে সমস্ত মৌলের আইসোটোপ তৈরি করা যায়।

প্রঃ মঙ্গলগ্রহ মানুষের বাসযোগ্য নয় কেন? মানুষ একে ভবিষ্যতে কি বাসযোগ্য করে তুলতে পারবে? পুলিন বিহারী সাউ, ইন্দা কৃষ্ণলাল শিক্ষায়তন—খড়্গপুর।

উঃ আগের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

পড়াশোনা দপ্তরে অনেক প্রশ্ন এসে জমা হয়েছে। যারা প্রশ্ন পাঠিয়েছে তারা 87 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। আগামী সংখ্যায় সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন সুধাংশু পাত্র।

ভবিষ্যতে বিজ্ঞান কী করতে পারবে না পারবে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানী করার বিপদ যথেষ্ট আছে। কিছু বলতে গেলে ব্যাপারটা কল্প বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে যাবে না কি?

প্রঃ ভোল্ট, অ্যাম্পিয়ার ও ওয়াট কি? অশোক মান্না মহেন্দ্রগঞ্জ—24 পরগনা।

উঃ ভোল্ট—এক কুলম্ব ধনাত্মক আধানকে অসীম থেকে তড়িৎক্ষেত্রের কোন এক বিশেষ বিন্দুতে আনতে যদি 10^7 আর্গস বা এক জুল কাজ করতে হয় তাহলে ঐ বিন্দুতে বিভব প্রভেদ হবে এক ভোল্ট। (বিভব প্রভেদের একক। 1 ভোল্ট $= \frac{1}{300}$ e. s. u.)

অ্যাম্পিয়ার—পরিবাহীর কোন বিন্দু দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে 1 কুলম্ব তড়িতাধান প্রবাহিত হলে পরিবাহীটির প্রবাহমাত্রাকে 1 অ্যাম্পিয়ার ধরা হয়। (তড়িৎপ্রবাহের ব্যবহারিক একক)

ওয়াট – যদি কোন বর্তনীতে এক ভোল্ট বিভব প্রভেদ হয় এবং তাতে এক অ্যাম্পিয়ার প্রবাহমাত্রা বর্তমান থাকে তাহলে ব্যয়িত ক্ষমতার পরিমাণ হবে এক ওয়াট। সুতরাং ওয়াট = ভোল্ট × অ্যাম্পিয়ার। (তড়িৎ ক্ষমতার একক)

প্রঃ ঢেঁকুর বা হেঁচকি ওঠে কেন? (1) সুধাংশুকান্তি সিনহা, 35 বঙ্কিমচন্দ্র এভিনিউ, বি-জোন দুর্গাপুর-5; (2) বিপ্লব দাস, প্রসেনজিৎ রায়, অরুণ নন্দী ও মল্লিকা-বৈদ্যপুর-বর্ধমান; (3) কে. পি. রায়—2/5 নাগার্জুন এক্সটেনশন-দুর্গাপুর-5।

উঃ—আমাদের বুক ও পেটের মাঝখানে মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম নামে একটি মাংসল পর্দা থাকে। এটি কোন কারণে উত্তেজিত হলে সেখানকার মাংসপেশীর সংকোচন ঘটে। ফলে আচমকা দ্রুত শ্বাসগ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। তখন আমাদের গলায় গ্লটিস নামক অংশটি—যেখানে রয়েছে আমাদের স্বরযন্ত্র, সেটিও সংকুচিত হয়। এই সংকোচনের সময় দ্রুত শ্বাস নিতে গেলে শ্বাস নেওয়াটা মাঝপথে থেমে যায় এবং এক রকমের শব্দ হয়। ওকেই আমরা হেঁচকি বলি।

মধ্যচ্ছদা আবার উত্তেজিত হয় পাকস্থলীর দেওয়াল উত্তেজিত হওয়ার ফলে। পাকস্থলীর উত্তেজনা এলে ওর উপরের দিকে কিছু বাতাস জমে ওঠে এবং এই বাতাস ঊর্ধ্বমুখী চাপ প্রদান করে। সাধারণত খুব তাড়াতাড়ি খাদ্য-বস্তুকে গলাধঃকরণ করলে! টক, ঝাল কিংবা উগ্র মশলাযুক্ত খাবার খেলে; ধূমপান করলে, ইত্যাদি নানাকারণে পাকস্থলীর দেওয়াল উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনা আপনা-হতেই উত্তেজিত করে মধ্যচ্ছদার স্নায়ুকে। আর তখনই মধ্যচ্ছদার সংকোচন ঘটে এবং শুরু হয় হেঁচকি। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় প্রতিবর্তক্রিয়া বা 'রিফ্লেক্স অ্যাকশন।'

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ক্ষেত্রে দুধ খাওয়ার সময় কিছু বাতাসকেও গিলে ফেলে বলে হেঁচকি বেশি হয়। যেকোন বয়সে হোক না কেন হেঁচকি ওঠা ভাল নয়। হেঁচকির সময় দু-এক ঢোক জল খেলে ওর উপশম হয়। যখন তখন হেঁচকি ওঠা মস্তিষ্কের টিউমার, কিডনীর রোগ ইত্যাদির লক্ষণ।

প্রঃ—মানুষের শরীরের রঙ ফর্সা কিংবা কালো হয় কেন? (1) পিণ্টু পাল, নতুনপাড়া, চন্দনগর, হুগলী। (2) অশোককুমার পাল, কাদিহাট-বেলবাড়ী পশ্চিম দিনাজপুর।

উঃ—চামড়ার অঃস্তস্ত্বকে থাকে একরকম রঞ্জন কলা। সেখান থেকে নিঃসৃত একরকম কালো রঞ্জক পদার্থ সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলি, বিশেষ করে ইন্‌ফ্রায়েড রশ্মি থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য দেহের বাহিরে একটা আস্তরণের সৃষ্টি করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলির প্রভাব বেশি থাকায় সেখানকার মানুষের দেহের চামড়ার আস্তরণটি গাঢ় কালো রঙের। অপরদিকে নাতিশীতোষ্ণ ও শীত প্রধান অঞ্চলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাব কম হওয়ায় কালো রঙের আস্তরণের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাই এখানকার মানুষের গায়ের রঙ ফর্সা। তবে গায়ের রঙের ক্ষেত্রে কিছুটা বংশধারাও কাজ করে থাকে।

প্রঃ—কোয়াসার ও ব্ল্যাক হোল সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে। (1) খালোড় বাগনান থেকে সৌরভ ভদ্র ও শুভাশীষ ভদ্র। (2) মোহনলাল বাহালওয়ালা রোড-বালী থেকে সোমেশ ভট্টাচার্য।

মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে দুটি সংখ্যায় দুটি প্রশ্নেরই আলোচনা করা হয়েছে। তোমরা একটু কষ্ট করে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখে নাও।

সুধাংশু পাত্র

বিজ্ঞানের খবর

অ্যাগাভে থেকে কাগজ

কাগজের চাহিদা যতই বাড়ছে—কাগজকলের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ইতিমধ্যেই এশিয়ার দেশগুলি থেকে বাঁশঝাড় নিঃশেষ হতে চলেছে। সম্প্রতি উড়িষ্যার 'সিসল রিসার্চ স্টেশন' (Sisal Research Station)-এর বিজ্ঞানীরা কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে অ্যাগাভে (Agave) নামে এক ধরনের গাছের উপযোগিতার কথা জানিয়েছেন। যে কোনও ধরনের মাটি এবং আবহাওয়ায় এ গাছের অঢেল ফলন হতে পারে। এর চাষেরও কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তাছাড়া খরা বন্যায় এ গাছের ফলনে বিশেষ হেরফের হয় না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও এর বেশী।

গত 1971 সাল থেকে দু'জাতের অ্যাগাভে নিয়ে গবেষণা চালানো হয়েছে উড়িষ্যার ঐ গবেষণাগারে। প্রথম জাতটি 'সিসল' নামে পরিচিত; দ্বিতীয়টি সংকর জাতের। দেখা গেছে, গড়ে প্রতি হেক্টর জমিতে সিসলের ফলন 43 টন, এবং সংকর জাতের অ্যাগাভের ফলন 76 টন। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে অ্যাগাভে গাছকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে কাগজ উৎপাদন চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। এভাবে আপাততঃ সেখানে প্রতিদিন প্রায় 300 টন উঁচুমানের কাগজ তৈরি হয়। কারেন্সি নোট, ফিল্টার কাগজ, সিগারেটের কাগজ তৈরিতে এর এখন খুবই চাহিদা।

রোগ সারাতে চোখের জল

বছর কয়েক আগে চোখের জলের উপকারিতা নিয়ে এক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন মিনেসোটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উইলিয়াম ফ্রে। তিনি দেখিয়েছিলেন, খানিকটা কান্নাকাটির পর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা—ক্ষতির আশঙ্কাজনিত মানসিক চাপ থেকে অব্যাহতি মেলে, মনের ভারটি হাল্কা হয়। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমীর জনাকয়েক গবেষক প্রমাণ করেছেন—শরীরের রোগ নিরাময়েও চোখের জল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সোভিয়েত গবেষকরা তাঁদের গবেষণাগারের ইঁদুরদের চামড়ায় কৃত্রিম ক্ষত সৃষ্টি করার পর সেইসব ইঁদরদের চোখে জ্বালা ধরানোর ব্যবস্থা করে দেখেছেন—চোখ দিয়ে জল ঝরার দরুন ইঁদুরদের ক্ষতগুলির চটপট নিরাময় হচ্ছে। এমন কি যে ইঁদুর যত বেশী কান্নাকাটি করছে, তার ক্ষত তত তাড়াতাড়ি নিরাময় হচ্ছে। পাশাপাশি, কিছু ইঁদুরের অশ্রুগ্রন্থি কেটে বাদ দেওয়ার পর দেখা গেছে—তাদের ক্ষত নিরাময়ে সময় লাগছে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি।

এই বিষয়টার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা বলছেন—কান্নার সময় অশ্রুগ্রন্থি থেকে যে জল বেরিয়ে আসে তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু রাসায়নিক থাকে যা রক্তে গিয়ে মেশার পর রোগ নিরাময়ের প্রক্রিয়াকে জোরদার করে। অন্ততঃ আমাদের চামড়ার ক্ষত বা অসুখবিসুখ দ্রুত নিরাময়ের ক্ষেত্রে চোখের জল যে নিশ্চিতভাবে কাজ করে সে বিষয়ে ওঁদের কোন সংশয় নেই।

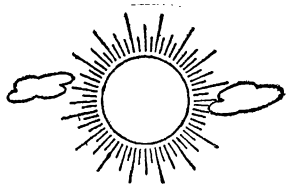

সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই প্রথম জ্যামিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমাদের 'মিল্কি ওয়ে' ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয় করলেন। স্মিথসোনিয়ান অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্যাল অবজার্ভেটরীর বিজ্ঞানী মার্ক রীডের হিসেব মত এই দূরত্ব হল তেইশ হাজার আলোকবর্ষ। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল—এই দূরত্ব প্রায় তেত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ। সাম্প্রতিক মাপঝোঁকের পর আমাদের ছায়া-পথের ব্যাসের মাপও কমে দাঁড়িয়েছে সত্তর হাজার আলোক বর্ষে। এর ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সম্পর্কেও বিজ্ঞানীদের ধারণা পাল্টে যেতে বসেছে। বর্তমান হিসেবে এই আয়তন হল একশ' থেকে দুশ' কোটি আলোকবর্ষ।

বিজ্ঞানীরা বলছেন—এই আবিষ্কারের ফলে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন দেখা দেবে। সব থেকে বড় কথা—মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময়কাল সম্পর্কে তাঁদের ধারণা হয়তো একদম পাল্টে যেতে পারে।

অমিত চক্রবর্তী

বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ক্যুইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

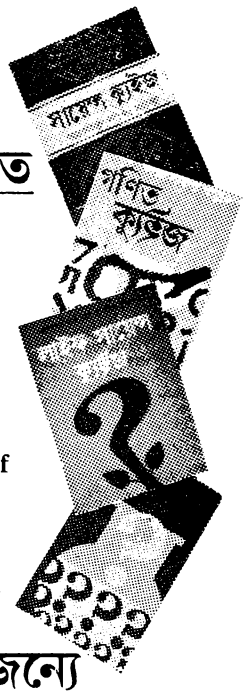

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations
—*The Statesman*

আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN6 th Yr Vol –9· JANUARY 1987/Regd.No.WBEC/255

স্টুডেন্ট সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

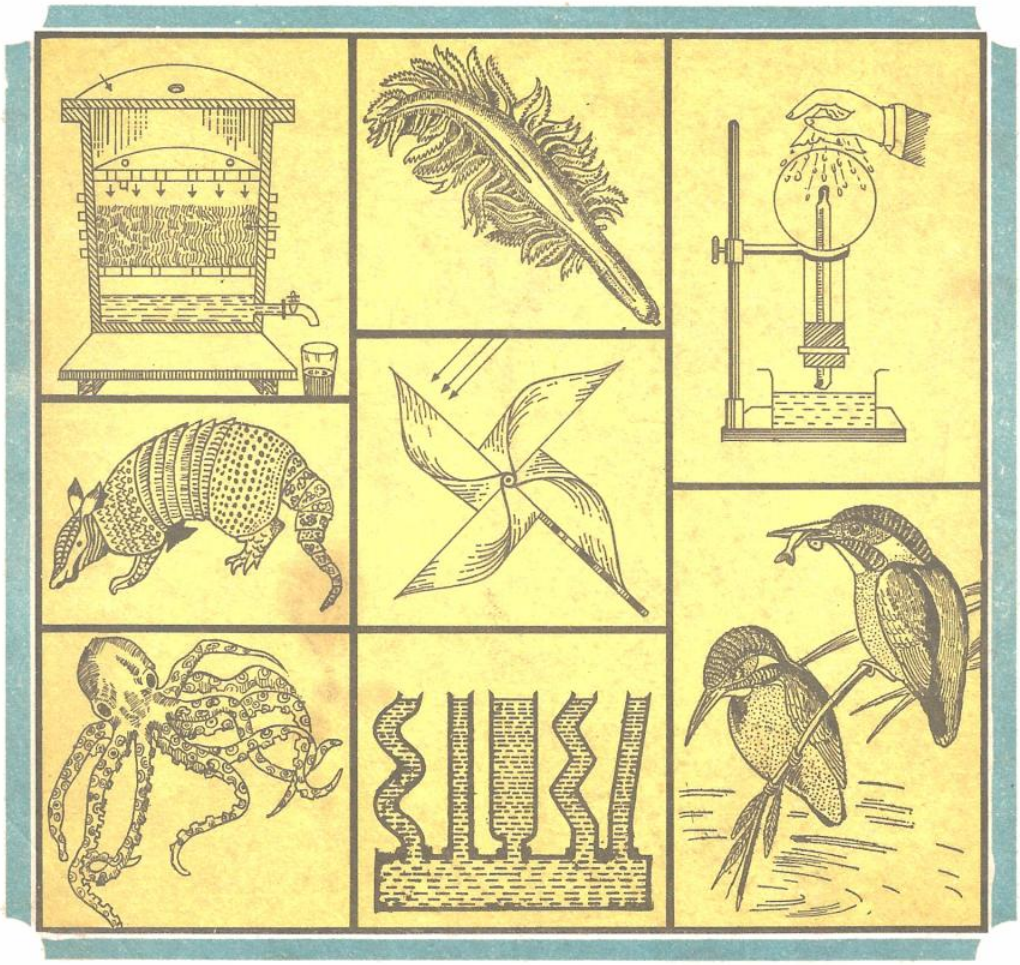

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং 8A, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-6, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত । প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রা: লি:, কলকাতা-12 ।

দাম ঃ 4·00 টাকা ।